মেবার-বহ্নি পদ্মিনী

শ্রীপারাবত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

মুদ্রক
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রিট
কলকাতা ৬

মেবার-বহ্নি পদ্মিনী

আলাউদ্দিন প্রচণ্ড উত্তেজনায় মসনদ ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। হ্যাঁ, আলাউদ্দিন—দিল্লীর অতি-পরাক্রান্ত সুলতান। যে নিজেই নিজেকে 'সেকেন্দার সাহনি' অর্থাৎ দ্বিতীয় সেকেন্দার উপাধিতে ভূষিত করেছে। সেই নামে যার মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। যুদ্ধবিদ্যায় সারা পৃথিবীতে যার তুলনা মেলা ভার। অসি হাতে শত্রুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের খতম করে দিয়ে সেই খুনে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে তোলায় যার অপার আনন্দ।

সুলতানকে অমন উন্মাদের মত উঠে পড়তে দেখে দরবার কক্ষের ওমরাহ থেকে শুরু করে সবাই ঝট্‌পট্ দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ে মনসুরের ওপর। একমাত্র সে-ই দায়ী। তারই উস্‌কানিতে সুলতান এমন আগুনের মত জ্বলে উঠেছে। এখন ঠেলা সামলাও। সব কিছুর একটা সীমা রয়েছে। সুলতান মাঝে মাঝে ঠাট্টা-মস্করার অনুমতি দেয় বলে মাত্রা ছাড়তে হবে? সাধারণ বুদ্ধির কোন মানুষ এমন বোকার মত কাজ করে?

কিন্তু না। শেষ পর্যন্ত মনসুর অক্ষতই থেকে গেল। সুলতান যেন নিজের অক্ষমতাতেই জ্বলতে জ্বলতে মসনদের ওপর সশব্দে বসে পড়ে উরুর ওপর থাবা মেরে হুংকার দিয়ে ওঠে,— ওকে আমার চাই-ই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপসী আমার হারেমের বাইরে থেকে যাবে? অসহ্য। রাজোয়ারা তো ঘরের কাছে। এর জন্যে আমি কাবুল কান্দাহার পারস্য পার হয়ে মিশর অবধি ধাওয়া করতে পারি। কে রুখবে আমাকে? কার সাধ্য আছে?

কথাটা উঠেছিল রমণীর রূপ নিয়ে। সুলতান গর্ব-ভরে বলছিল যে তার হারেমে পারস্যের অতি রূপসী রমণীও রয়েছে। সবাই স্তোক বাক্যে তাকেই উৎসাহিত করছিল। সুলতানও বেশ পুলকিত ছিল।

হঠাৎ মনসুর বেমক্কা খোঁচা দিয়ে বসল। বলল—আপনার হারেম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হারেম জাঁহাপনা। কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু—

কথাটা শেষ করতে পারে না মনসুর। কারণ কয়েকজন ওমরাহ আকারে-

ইঙ্গিতে চোখটিপে ভ্রূকুটি করে তাকে চেপে যেতে বলে। একজন তো পেছন থেকে খোঁচাও দিয়ে বসে। থতমত খেয়ে সে থেমে যায়। কিন্তু ওই 'কিন্তুই' বিপদ ঘটায়।

সুলতান বলে ওঠে,—বল বল। থামলে কেন?

—না জাঁহাপনা। কিছু নয়।

আলাউদ্দিন ধমকে ওঠে,—মিথ্যে কথা। তুমি একটা কিছু বলতে বলতে থেমে গেলে।

মনসুর একটু চুপ করে থাকে। তারপর ঢোক গিলে মরিয়া হয়ে বলে ফেলে,—আপনার রূপসীদের হাসিতে বিদ্যুতের চমক আছে সুলতান? আপনার বেগমদের চলার পথে গুলাব ফুটে ওঠে? আপনিই ভাল জানেন। তাঁদের চোখের তারায় আশমানের ছায়া পড়ে? হয়ত পড়ে। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছেন যাঁর ওষ্ঠের সামনে ভ্রমর এসে গুনগুন করে ফুল ভেবে?

আলাউদ্দিন হেসে বলে—চমৎকার বলেছ। এ সব কোথায় পড়লে মনসুর? কার লেখা শায়ার? আমাকে দিও তো, পড়ব।

—শায়ার নয় জাঁহাপনা। এ হল বাস্তব সত্য। চন্দ্রের মত সত্য।

সুলতানের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। টিপে টিপে বলে,—হুঁ, তাই নাকি? কোথায় সেই রূপসী? কোন্ মুলুকে?

মনসুরের তামাসা করার সখ অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল। এবারে সে ভয় পেয়ে যায়। কি বলবে ভেবে পায় না।

সুলতান ফেটে পড়ে,—চুপ করে আছো কেন? শিগ্‌গির বল।

—আজ্ঞে মেবারে খোদাবন্দ।

সবার মুখে কথাটা উচ্চারিত হয়। দরবার কক্ষ গম্ গম্ করে ওঠে।

আলাউদ্দিন জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে বলে,—রাণার মহিষী বুঝি?

—না জাঁহাপনা। রাণার চাচা ভীম সিং-এর পত্নী।

দরবার কক্ষ স্তব্ধ। সবাই স্তম্ভিত মনসুরের উক্তির দৃঢ়তায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, সে মিথ্যা বলছে না। অন্তত পক্ষে, সঠিক সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই আলাউদ্দিনের মত রগ-চটা সুলতানের কাছে এভাবে বলতে পারছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তারা বুঝে ফেলে, দিল্লীতে বসে আরাম করার দিন ফুরিয়ে এল। অভিযানে বার হতে হবে। কারণ দিল্লীর সুলতান এমন একজন যুদ্ধবিশারদ যিনি পৃথিবীর যে কোন নৃপতিকে পরাস্ত করতে পারেন। মেবার তো কোন ছার।

সুলতান বলে,—কী নাম সেই রূপসীর?

—পদ্মিনী।

কথাটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল সারা দিল্লী নগরীতে। দরবার কক্ষে খানদানী ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরও কিছু লোক থাকে, যারা অতি সাধারণ হয়েও সব কিছু দেখার আর শোনার সুযোগ পায়। তারা গোলামগিরি করে, কিংবা দ্বাররক্ষী বা দেহরক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকে। সুতরাং কোন ঘটনাই চাপা থাকে না। এটিও রইল না।

আর রইল না বলেই এক তরুণ রাজপুতের কানে কথাটা গিয়ে পৌছোল এক দিন। যদিও তারুণ্যে পদার্পণের আগেই ভাগ্য বিপর্যয়ে সে তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে বছর চৌদ্দ আগে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। পিতা এখন মৃত। সে নিজে সুলতানের বাহিনীতে স্থান করে নিয়েছে। সুখেই আছে। নাম তার জগত সিং।

মেবারের কোন সংবাদ জগত রাখে না। পদ্মিনী নামে কোন রূপসী রমণী রাণা পরিবারে রয়েছেন কিনা এ খবরও তার জানা নেই। তবু লোকের মুখে সুলতান আলাউদ্দিনের দম্ভ আর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে তার মনের ভেতরে কী যেন হয়ে গেল। কোথায় একটা ভাঙন ধরল। শেষে একদিন কাউকে কিছু না বলে রাতের অন্ধকারে তস্করের মত দিল্লী ছাড়ল।

পথ অচেনা। অশ্বটিও তার নিজের নয়। সেটি হল তার একমাত্র সুহৃদ ইমতিয়াজের। ভোর হতেই খোঁজ পডবে। বড় প্রিয় অশ্বটি তার। সকালে উঠে নামাজ পড়ার পরেই সে এটির পরিচর্যা সুরু করে দেয়। সুন্দর তেজী ভঙ্গি এটির। উজ্জ্বল বাদামী রঙ আর ঘাড়ের ঝালর সাদা।

বিদায়ের সময় ইমতিয়াজকে বলে এলেও পারত সে। বাধা দিত না কখনই। পৃথিবীর আর কেউ না বুঝুক সে অন্ততঃ বুঝত জগতের মনোভাব। কিন্তু পারল না শুধু অশ্বটির জন্যে। এটিকে সে কিছুতেই হাত ছাড়া করত না। বরং নতুন ঘোড়া কিনে নেবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করে দিত। সেটি সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া ও ভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দিল্লী ছাড়া নিরাপদ নয়। সম্ভবও হতো না বোধ হয়। সৈন্যবাহিনী থেকে ছুটি পাওয়া সহজ নয়।

মেবারের ঊষর ভূমিতে পদার্পণ করেই জগত সিং এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। কিসের এই আকর্ষণ ঠাহর করতে পারে না। একি মাটির ভেতর থেকে উঠে এসে বাহু বিস্তার করে তাকে জড়িয়ে ধরার আকর্ষণ? বুঝতে পারে না সে। শুধু একটা ভাবোচ্ছ্বাস তার বুকের ভেতর বার বার দলা পাকিয়ে ওঠে। সে ছট্-ফট্ করে ঘোড়ার পিঠে বসে।

ইমতিয়াজের ঘোড়াটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। মাঝে শুধু দুটো দিন তাকে

একটানা বিশ্রাম দিতে হয়েছে। কারণ তার সামনের ডান পায়ের নীচে একটা ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ক্ষত নিয়ে চললে ঘোড়াটিকে একেবারে বর্জন করতে হত। এত অল্প সময়ে নিজের জন্মভূমিতে পৌঁছতে পারত না। ইমতি-য়াজের সঙ্গে থেকে ঘোড়ার তদারকির ব্যাপারে কিছু জ্ঞান হয়েছে তার।

জগত সিং বুঝে নিয়েছে দিল্লী নগরীকে জীবনে আর কখনো দেখার সৌভাগ্য তার হবে না। সেখান থেকে সে চিরবিদায় নিয়েছে। যেভাবে হোক এই মেবারেই তাকে নিজের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। বলতে গেলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। কিন্তু এই ঘরে ইমতিয়াজের মত দোস্ত মিলবে কিনা সন্দেহ। আত্মীয় স্বজন কেউ আছে কিনা ঠিক নেই। তবু এ যে তার নিজের ঘর তাতে সন্দেহ নেই কোন।

কিন্তু এই ঘরে শান্তি বজায় থাকবে কি? দিল্লী থেকে অশান্তির এক প্রবল ঘূর্ণীঝড় সত্বর ধেয়ে আসবে এইদিকে। সেই ঝড়ে কত কি যে ওলট-পালট হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। কারও ধারণাও নেই এখনো, দিগন্তে কালো মেঘের সমাবেশ হয়েছে।

ওই – ওই যে চিতোর দেখা যাচ্ছে। কত ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে দূর থেকে। এক রাখাল বালক তাকে না দেখিয়ে দিলে সে বিশ্বাসই করতে পারত না চিতোর বলে। পাহাড়ের ওপর যেন খেলনার বাড়ি। ওই চিতোরের তুলনায় দিল্লী কত বড়, কত সমৃদ্ধ। তবু ওরই পায়ে মন প্রাণ সমর্পণ করে বসে রয়েছে জগত সিং। শত হলেও চিতোর চিতোরই। স্বমহিমায় ভাস্বর। বাবা কত কাহিনী শুনিয়েছেন তাকে। সেই আদি যুগ থেকে সূর্য বংশের ধারা নেমে এসেছে ওখানে। বাপ্পা, সংগ্রাম, কুম্ভ আরও কত বীর স্বদেশ প্রেমিকের কথা। সীমিত সঙ্গতি নিয়ে তাঁরা দেশের জন্যে রক্ত ঢেলেছেন। গাথা হয়ে সুরের মূর্ছনায় আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাঁদের কীর্তির কথা।

জগত সিং প্রণাম জানায়। তারপর সোজা এগিয়ে যায় চিতোরের পাহাড় লক্ষ্য করে। কার্তিক মাস। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। আজ রাতে তার বিশ্রামের স্থান হবে চিতোর। এগিয়ে চলে সে। বাবা রাজভক্ত হয়েও স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন একজনের চরম শত্রুতায়। তাঁকে কৌশলে হত্যা করতে চেয়েছিল লোকটি। সম্মুখ যুদ্ধে বাবা পশ্চাদপদ ছিলেন না। কিন্তু ঘৃণ্য উপায়ে তাঁকে খুনের প্রচেষ্টা হওয়ায় পুত্রের মুখ চেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লীতে।

চিতোরের পাহাড়ের নীচে এসে থেমে পড়তে হয় জগতকে। নীচের সমতল ভূমিতে অসংখ্য মানুষের ভীড়। মেলা বসেছে নিশ্চয়। কিসের মেলা বুঝতে

পারে না। এখানকার রীতি নীতি এবং প্রথা সম্বন্ধে বলতে গেলে তার কোন ধারণাই নেই। সে জানে কোন্ চান্দ্র মাসে ঈদ হয়। কখন মহররমের চাঁদ উদিত হয়ে দুনিয়ার মানুষের নয়নে অশ্রুধারা বইয়ে দেয়। সে জানে মুসলমানেরা কখন গোরস্থানে গিয়ে তাদের অতি প্রিয়জনের সমাধিস্থলে প্রদীপ দিয়ে আসে। কিন্তু মেবারের সবকিছুই তার অজানা।

ভীড়ের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছোয় জগত, সূর্য একটি ছোট্ট পাহাড়ে মুখ ঢাকার জন্যে তোড়জোড় করছে। একটু পরেই গোধূলি লগ্ন শুরু হবে। এখন চারদিকে একটা স্বর্গীয় সুষমা বিরাজ করছে। চিতোর দুর্গ রক্তিম কিরণে হাজার মাণিকের সেরা মাণিকের মত রাঙিয়ে উঠেছে।

জগত দেখতে পায় অনেক গাভী সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। গরুর হাট এটি নয়। কারণ গাভীগুলোর শিং-এ সিঁদুরের প্রলেপ, গলায় ফুলের মালা। তারাই যেন আজকের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে। এ ধরনের দৃশ্য দেখতে আদৌ অভ্যস্ত নয় জগত। বেশ একটা কৌতুক অনুভব করে। সবাই গাভীদের সেবা করছে, তোয়াজ করছে। তারাও তাদের স্বভাব-সুলভ নির্বিকারত্ব নিয়ে সবার সেবা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করছে। পৃথিবীতে কী হচ্ছে না হচ্ছে এতে তারা একটুও কৌতূহলান্বিত নয়। যেন জেনে বসে আছে তারা দুদিনের জন্যে এসেছে ধরণীতে, দিন ফুরোলেই আসল জায়গায় চলে যাবে।

ঘোড়া থেকে নেমে জগত এগিয়ে গিয়ে একজন তরুণের পাশে দাঁড়ায়। তরুণটির চেহারা এবং পোষাকে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আর পারিপাট্য রয়েছে। তার দেহের গঠনও একটু যেন অন্যরকমের। সাধারণ রাজপুতের মত অতটা বলিষ্ঠ আর সুঠাম নয়। অমন তো কত দেখা যায়। জগত সব কিছু ভালভাবে জেনে নেবার জন্যে একেই নির্বাচন করে নিল। এ অন্যের চেয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

সে তরুণটির কাঁধ স্পর্শ করে। তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত দৃষ্টি হানে তার দিকে।

জগত প্রশ্ন করে,— এ সব কি ?

তরুণটি তাকে ভালভাবে দেখে নিয়ে বলে—তাই বল। তুমি নতুন এসেছ এ দেশে। ওভাবে আমাকে স্পর্শ করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম।

—কেন ? তোমার গায়ে হাত দিতে নেই বুঝি ? আমি কোন অন্যায় করে ফেলেছি কি ?

—না। একটুও নয়। তবে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই। কোথা থেকে এসেছ ? রাজপুত বলেই তো মনে হয়।

—হ্যাঁ রাজপুত। মেবারেই জন্ম—এই চিতোরে। বহুদিন বিদেশে ছিলাম। ছেলেবেলা থেকে। এ সব কিসের উৎসব ?

—আজ অন্নকূটের উৎসব। ষোলই কার্তিক। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তুমি কিছুই জান না ?

—না। আচ্ছা, গরুগুলোকে নিয়ে ওসব করছে কেন ?

—আজ গো-পুজোর দিন। মহারাণা থেকে শুরু করে সবাই এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন।

জগতের চোখে মুখে উৎসাহ ফুটে ওঠে। বলে,—মহারাণাও এখানে আছেন ? কোথায় তিনি ?

জগতের অতি আগ্রহে তরুণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। সে আপাদমস্তক জগতকে কয়েকবার নিরীক্ষণ করে। তারপর বলে—এখন বলা সম্ভব নয়।

—কেন ? কি হল ? এখনি বল না।

—না। তরুণের কণ্ঠস্বর রীতিমত কঠোর শোনায়।

জগত চুপ করে কিছু ভেবে নেয়। তারপর বলে—তাহলে ওই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কথাই বল।

—আজ যমুনা নদী তাঁর ভাই যমকে আদর-আপ্যায়ন করেন। সেই সঙ্গে দেশের সব বোনেরাই ভাইদের কপালে ফোঁটা দেয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যম নিজে যমুনা দেবীর ভাই বলে সবার ভাইদের প্রতি একটু সহৃদয় হবেন।

জগত সিং হেসে ওঠে। বেশ মজা লাগে তার। তরুণ বিরক্ত হয়ে বলে—হাসলে যে ?

—না এমনি। এসব আমি জানি না। তাছাড়া আমার বোনও তো নেই। থাকলে হয়ত জানতে পারতাম।

—তুমি এসব জান না ভাল কথা। আমিও বুঝেছি, তুমি কিছুই জান না। তাই বলে, হাসিঠাট্টা করাটা উচিত না।

—না না। আমি সেভাবে হাসিনি। অশ্রদ্ধা করিনি আমি।

—তুমি ঈদ দেখেছ ?

—নিশ্চয়। সুন্দর উৎসব। কতখানি সহিষ্ণুতা, কত শ্রদ্ধা—

—হুঁ। বুঝেছি।

—কি বুঝলে ?

—কিছু না। আমি চলি।

তরুণ দ্রুত ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়। জগত সিং ওর হাবভাবে অবাক হয়।

একবার তার মনে হয়, এখানকার মানুষেরা বোধহয় এমনই হয়। তারপর ভাবে তার হাসিকে সহজভাবে নিতে পারেনি তরুণটি। সে ধীরে ধীরে একজন কৃষক-শ্রেণীর মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। লোকটি তাকে দেখে সরে যায়।

—সরে যাচ্ছ কেন ভাই?

—নতুন এসেছ?

—হ্যাঁ।

—অন্নকূট উৎসব দেখতে বুঝি?

জগত উৎসবটার নাম কিছুক্ষণ আগে শুনেছে। ভালভাবে জানার জন্যে বলে—সেটা কখন হয়? কি হয় তাতে?

- জান না? সাতটি রাজ্য থেকে নানান্ দেবতার মূর্তি এসে গিয়েছে চিতোরে। আজই তো উৎসবের শেষ দিন। সেরা দিনও বলতে পার। অন্নের পাহাড় জমে উঠবে। দেখবার মত দৃশ্য। দেখে যেও।

— নিশ্চয় দেখব। সব দেখব।

— কোন্ দেশ থেকে আসা হল? মারাঠী?

জগত সিং সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, - আচ্ছা, ওই যে সুন্দর পোষাকে দুজন দাঁড়িয়ে আছেন লাঙ্গলের পাশে। ওঁরা কারা?

লোকটি প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে যায়। হাঁ করে জগতকে দেখতে দেখতে বলে— সে কি গো? আমাদের মহারাণাকেও চেনো না? ওঁদের দুজনার মধ্যে ডান দিকে দাঁড়িয়ে যিনি গম্ভীর হয়ে আছেন তিনি হলেন রাণা লক্ষ্মণ সিং। আর যিনি হাসছেন, তিনি হলেন ভীম সিং। রাণার কাকা ভীম সিং।

জগত সিং এর চোখের পলক পড়ে না। এঁরাই হলেন বাপ্পার বংশধর। সে দুই নয়ন ভরে দেখে। রাণা নিজে নেমে এসেছেন কৃষক ভাইদের মধ্যে। নিজে গোমাতার সেবা করছেন, হলকর্ষণ করছেন। এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হলেও এর মধ্যে সত্য নিহিত রয়েছে। অথচ দিল্লীর সুলতান একেবারে অন্যরকম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার ক্ষীণ যোগাযোগও নেই। জগত সিং এতক্ষণে যেন কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে, কেন মেবারের প্রতিটি মানুষ দেশকে এত ভালবাসে। দেশের জন্যে যুগ যুগ ধরে কেন তারা তাদের রক্ত ঊষর প্রান্তরে ঢেলে দেয়।

সহসা সে ভীমসিং-এর পাশে আগের তরুণটিকে দেখতে পায়। লক্ষ্য করে, তরুণটি মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এত লোকজনের মধ্যেও তার দিকে ঠিক নজর রেখেছে। বোধহয় তাকে স্পর্শ করাটা সহজভাবে নিতে পারেনি। কিংবা ওই হাসিটা।

পাশের লোকটিকে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা রাণার কাছে ওই তরুণটি কে?

—ও তো বাদল।

—দেখলে মনে হয় যেন অন্য দেশের মানুষ। তাই নয়?

—ঠিকই ধরেছ। ও অন্য দেশ থেকে এসেছে। রাণী পদ্মিনীর আত্মীয়।

চমকে ওঠে জগত সিং। পদ্মিনী! নামটির মধ্যে কী যেন রয়েছে। এই পদ্মিনী তার ভবিষ্যৎকে একেবারে পালটে দিয়েছে। এই পদ্মিনী তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করেছে। এরা কত নিশ্চিন্ত। উৎসবে মেতে রয়েছে সবাই। রাণা থেকে সাধারণ মানুষটি পর্যন্ত কত উৎফুল্ল। অথচ দিল্লীতে হয়ত এতদিনে সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছে। হয়ত ইমতিয়াজও তার অস্ত্রগুলো শানিত করে নিচ্ছে। কামারশালায় দিনরাত লোহাপেটা হচ্ছে। আজ সে নিজে দিল্লী থাকলেও ওদেরই মত ব্যস্ত থাকত।

পদ্মিনী। ওই ভীম সিং-এর পত্নী। তাঁর ওষ্ঠের সামনে নাকি ভ্রমর গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওই চিতোরের কোন প্রাসাদের এক কক্ষে কত নিশ্চিন্তেই না বসে রয়েছেন। কল্পনাও করতে পারছেন না তাঁকে ঘিরে কত বড় সর্বনাশ নেমে আসছে মেবারের ভাগ্যে।

হলকর্ষণ শুরু হয়। প্রথমে রাণা, তারপরে সবাই। রাণা আর সাধারণ মানুষ মিলে মিশে একাকার।

সন্ধ্যা নেমে আসে। আশেপাশের পাহাড়গুলো কালো হতে শুরু করে। উৎসবও শেষ হয়। জগত সিং ভাবে, এবারে সবার সঙ্গে চিতোরে প্রবেশ করবে সে। ওদের সবার মত এই চিতোর তারও। সমান অধিকার তার। ওদের মত সে-ও ওখানে গিয়ে অন্নকূট উৎসবে মেতে উঠবে শুধু আজ রাতটুকুর জন্যে। এই আনন্দের দিনে অমন একটি নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে রাণার সামনে হাজির হওয়া যায় না।

অশ্বটির কাছে গিয়ে জগত লাগাম ধরে সেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে। সেই সময় আগের তরুণটি তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। জগত সিং জেনে ফেলেছে এর নাম বাদল। বাদলের হাতে এখন মোষের শিং-এর ধনুক, পিঠের তূণে তীর। সুন্দর দেখায়। এই জিনিসটি দিল্লীতে অতটা চালু নেই।

কিন্তু বাদলের ভঙ্গিতে যুদ্ধং দেহি ভাব। মজা করতে চাইছে হয়ত পদ্মিনীর আত্মীয়টি। সে মৃদু হেসে বলে – ক্ষমা করবেন। আপনাকে না জেনে ঠিকমত সম্বোধন করিনি আমি। দয়া করে পথ ছাড়ুন। চিতোরে যাব। উৎসব দেখব।

—না।

জগতের অবাক হবার পালা। সে বাদলের মনোভাব বুঝতে না পেরে বলে—বাদল! আপনি কি আপনার পদমর্যাদা অনুযায়ী কাজ করছেন? আমি সামান্য রাজপুত। এভাবে বাধা দেওয়া আপনার শোভা পায় না।

—আমার নামটিও জান দেখছি। সেইরকমই আশঙ্কা করেছিলাম অবশ্য।

—কেন? আপনাদের দেশে নাম জানার রীতি নেই নাকি?

বাদল ভীষণ রেগে যায়। বলে, –তোমাকে বন্দী করা হবে।

—আমাকে? আমার অপরাধ?

—তুমি দিল্লীর সুলতানের গুপ্তচর। গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তোমাকে পাঠানো হয়েছে।

কথাটা শুনে জগত সিং কিন্তু মনে মনে খুশী হয়। মেবার মোটেই ঘুমিয়ে নেই। খুব সজাগ। সে ভেবে পায় না কি ভাবে এরা টের পেল যে সে দিল্লী থেকে আসছে।

—আমি দিল্লী থেকে আসছি, তার প্রমাণ পেয়েছেন কিছু?

বাদলের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। আবছা অন্ধকারেও সে হাসি জগতের দৃষ্টি এড়ায় না। স্থানটি ইতিমধ্যে প্রায় নির্জন হয়ে গিয়েছে। সবাই ছুটে চলেছে চিতোরের দিকে। বিশেষ কেউ অবশিষ্ট নেই। শুধু বাদলের আদেশে কিছু ব্যক্তি অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলাই বাহুল্য তারা সশস্ত্র।

বাদল বলে, তুমি গুপ্তচরের খাতায় নতুন নাম লিখিয়েছ। তাই দিল্লীর সাক্ষ্য নিজে বহন করেও বুঝতে পার না।

জগত ভালভাবে নিজের দিকে চায়। পোষাক পরিচ্ছদে কোনরকম বৈশিষ্ট্য নেই। পাদুকাও অতি সাধারণ। তবে? শেষে নিজের অসির দিকে নজর পড়ে। রাজপুতদের তলোয়ার এমন হয় না। তাদের অধিকাংশ তলোয়ারের দুই দিকই ধারালো। গড়নও অন্য রকম। মনে মনে সে বাদলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারে না।

হেসে বলে—সাবাস। আপনি ঠিক ধরেছেন।

—তুমি বন্দী।

—কিন্তু কেন? আমি মেবারের মানুষ। দিল্লী থেকে আসছি বটে। তবে গুপ্তচর নই।

—সেই প্রমাণ হবে আগামীকাল। রাজসভায়। আমাদের সঙ্গে চল।

—কিন্তু আমার ঘোড়া?

—সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জগত সিং ভাবে, এ একরকম মন্দ হল না। আজকের উৎসব নির্বিঘ্নে কেটে যাক। কাল সকালে রাজসভায় খবরটা বলতে পারবে সে। আজকের রাতের উৎসব দেখার বড় সাধ ছিল। পূর্ণ হল না সেই সাধ। কত কিছুই তো অপূর্ণ থেকে যায় জীবনে।

বাদলের দিকে চেয়ে সে বলে,—ভালভাবে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলুন। নইলে আপনার প্রাণ সংশয় হতে পারে। জানেন তো, গুপ্তচররা ধরা পড়লে মরিয়া হয়ে ওঠে?

—আমাকে তুমি আক্রমণ করবে?

—করতে পারি। আশ্চর্যের কি আছে?

—বেশ তো। এসো। এক হাত হয়ে যাক।

—আমার আক্রমণ হবে আকস্মিক। আপনাদের চারজনের বিরুদ্ধে লড়ে মরতে যাব কোন দুঃখে?

—রাজপুতদের নিয়ম-কানুন কিছুই জান না দেখছি। অথচ রাজপুত সেজে এসেছ। গুপ্তচর হতে হলে সব কিছু সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জ্ঞান থাকা দরকার। আমি একাই লড়তে চাই তোমার সঙ্গে।

—আপনি এখনো ছেলেমানুষ। বয়স খুবই কম।

বাদল তার ধনুক আছড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে বলে,—এসো, দেখা যাক কে ছেলেমানুষ।

জগত সিং আমোদ পায়। ভাবে চিতোরে থেকে থেকে তরুণ একেবারে খাঁটি রাজপুত হয়ে গিয়েছে।

—নাঃ, লড়ব না আপনার সঙ্গে। আজকে অন্তত নয়। কাল দেখা যাবে।

ভীম সিং প্রাসাদে ফিরে আসেনি। রাণাও নেই। তারা অন্নকূট উৎসবের শেষ পর্বের জন্যে ব্যস্ত রয়েছে।

বাদল তাই পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা করতে আসে। গুপ্তচরের সংবাদটি সে-ই সবচেয়ে আগে জানাবে।

পদ্মিনী একাকিনী দাঁড়িয়ে ছিল অলিন্দে। তার দৃষ্টি প্রসারিত সুদূর দিগন্তে—যে দিগন্তে অন্ধকার চেপে বসেছে। তবু নীচের দুচারটি কুটিরের প্রদীপের আলো আকাশের তারার মত কাঁপতে দেখা যায়। হিমেল হাওয়া বইছে। সেই হাওয়া মহিষীর গায়ের ওড়নাকে বারবার স্থানচ্যুত করে দিচ্ছে।

বাদল সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কে? ও বাদল? কি রকম হল সব? প্রজাদের কেমন আনন্দ দেখলে?

—খুব। আজ একটা মজা হয়েছে।

—কি মজা?

—একজন লোককে ধরে এনে বন্দী করে রেখেছি।

—বন্দী? এই আনন্দের দিনে বন্দী করতে গেলে কেন বাদল? ভাবতো, তার বাড়ির লোকদের কত দুঃখ হবে। সারা বছরে এই দিনটির জন্যে সবাই যে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে।

—সেই লোকটা আমাদের কেউ নয়। যদিও বলছে মেবারই তার জন্মভূমি। হতে পারে। তারই সুযোগ নিয়ে গুপ্তচরগিরি করতে এসেছিল। ধরা পড়ে গিয়েছে। আমিই ধরেছি।

—গুপ্তচর? কোথাকার গুপ্তচর?

—যতদূর মনে হচ্ছে, দিল্লীর সুলতানের।

—দিল্লীর সুলতান? আলাউদ্দিন—

বাদল পদ্মিনীর সুরেলা কণ্ঠে কিসের যেন আভাষ পায়। সবাই জানে আলাউদ্দিন কী সাংঘাতিক মানুষ। যুদ্ধে সে অতি নিপুণ। পরাক্রমে সে অতুলনীয়।

সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—এখনো সঠিক কিছু বলা যায় না। কাল সকালে রাজসভায় নিয়ে গিয়ে হাজির করব। লোকটা অদ্ভুত—

—কি রকম?

—ওকে যে বন্দী করলাম, তার জন্যে এতটুকু বিচলিত বলে মনে হল না। তার যত আক্ষেপ আজকের উৎসব দেখা হল না বলে।

—লোকটা হয়ত ভাল। তোমার ভুল হতে পারে।

—না। তার সঙ্গে সুলতানের বাহিনীর তলোয়ার রয়েছে। তাছাড়া অল্পসময়ে সে অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেলেছিল।

পদ্মিনী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। একজন পরিচারিকা বাতিদানীতে বাতি দিয়ে যায়। সেই বাতির শিখা বাইরের হাওয়ায় কাঁপতে থাকে।

পদ্মিনী বলে কালই সব বুঝতে পারা যাবে তো?

—নিশ্চয়ই। বাবা রাম সিং-এর জেরার কাছে সবাই কাবু।

পদ্মিনীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

অলিন্দের অপর প্রান্ত থেকে পদ শব্দ ভেসে আসে। অতি পরিচিত ভারী

পায়ের শব্দ। বাদল পাশের একটি দ্বার দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়। ভীম সিং আসছে।

—পদ্মিনী?

গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায় ভীম সিং-এর অন্য প্রকোষ্ঠে।

পদ্মিনী একটু বিস্মিত। সে ভাবতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি তার স্বামী আজ ফিরে আসবে। প্রতিদিনই রাজসভা থেকে একটু আগে ফিরে আসে। কেন আসে তাও অজানা নয়। এজন্যে পদ্মিনী মনে মনে খুশী হলেও কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করতে ছাড়ে না। তাই বলে আজও? এই বিশেষ দিনে?

—পদ্মিনী? কোথায় তুমি?

ইতিমধ্যে কয়েকটি কক্ষ পার হয়ে ভীম সিং এদিকেই আসছে। পদ্মিনী তাড়াতাড়ি বাতির কাছ থেকে সরে গিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় আত্মগোপন করে।

ভীমসিং এসে পাগলের মত খুঁজতে থাকে। তার কণ্ঠস্বর উদ্বেগে আকুল।

পদ্মিনী আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে ওঠে, এই তো আমি। এখানে। বাবাঃ আমি যেন হারিয়েই গিয়েছি।

ভীমসিং ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—উঃ, কী ভয় পেয়েছিলাম। আমার রাণীকে না পেয়ে—

কৌতুক করে পদ্মিনী বলে—সত্যি? মিথ্যে বলছ না তো? তোমরা শুনি অভিনয়ে খুব পটু হও। দেখি তোমার বুক?

পদ্মিনী স্বামীর বুকে বাঁ দিকে হাত দিয়ে অনুভব করে বলে, —ওমা সত্যিই যেন একটু বেশী ধুক ধুক করছে। ছিঃ তুমি না রাজপুত? তুমি না সূর্যবংশের সন্তান? মহারাণা নাবালক থাকার সময় তুমি না রাজ্য চালাতে?

ভীম সিং অসহায়ভাবে বলে,—ওসবের সঙ্গে আমার রাণীর তুলনা? আমার হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেললে বাঁচবো আমি? বল, তুমিই বল।

—তা তো বাঁচবেই না। কিন্তু এত ভয় কেন রাজপুত হয়ে?

—আমি কি যুদ্ধ করতে ভয় পাই? আমি কি শিকারে যেতে ভয় পাই?

যুদ্ধে তোমার হৃদপিণ্ড শত্রুর বর্শায় বিদ্ধ হলে ভয় পাবে না?

—কখনই না।

—তবে? আমি কি তোমার হৃদপিণ্ডের চেয়েও বড়?

—সেই কথাই তো তোমাকে বোঝাতে চাই। আমার হৃদপিণ্ডের চেয়েও তুমি কোটি কোটি গুণ বড়। আমার রাণী—

ভীমসিং পদ্মিনীকে আদর করতে থাকে। পদ্মিনীর কেশ-বেশ অসংবৃত হয়ে

পড়ে। বলে ওঠে,—এবারে রক্ষা কর। আর পারি নে। কে যে কোথা থেকে দেখে ফেলবে। কেলেঙ্কারী হবে একটা।

—কেউ দেখবে না। সবাই জানে আমি এসেছি।

—যদি দেখে ফেলে ?

—বয়ে গেল। আমি কি অন্যায় করছি ?

—কিন্তু আজও তুমি তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন ? রাণা লক্ষ্মণ সিং কি ভাববে বলতো ? তারও রাণী আছে। সে বয়সে তোমার চেয়ে ছোট।

—ছোট হোক, বড় হোক কিছুই এসে যায় না। এই বিশ্বে পদ্মিনী শুধু একজনই আছে। সে আমার।

—ছি ছি, আমি পদ্মিনী না হলে তুমি আমাকে ভালবাসতে না ?

—ওসব কঠিন প্রশ্ন করলে চুপ করে থাকব। ওসব ধাঁধার উত্তর দেবার সামর্থ আমার নেই। তুমি ভালভাবেই জান।

—জানি। তোমার ভালবাসা যতখানি তার চেয়েও বেশী মোহ।

—হোক মোহ। এই মোহেরও একটা মোহ আছে। আমি যেন মোহমুক্ত না হই কোনদিন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকি।

—কিন্তু মশায়, এই মোহ সর্বনাশ ডেকে আনে।

—আসুক। সব সর্বনাশ ঘটে যাক। শুধু, তুমি আমার কাছে থাকবে। এইভাবে—চিরকাল।

পদ্মিনী দূরে সরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে—আর তোমার মেবার ?

—হ্যা মেবার। মেবার আমার জন্মভূমি। মেবার আমার মা। মা-ই তো পুত্রবধূ ঘরে আনেন। বধূকে পুত্র ভালবাসবে, এই ভয়ে মা কি ছেলের বিয়ে দেন না ?

—হুঁ। খুব তো বড় বড় যুক্তি খাড়া করছ দেখছি।

—আমাকে যতটা বোকা ভাব ততটা নই প্রিয়তমে।

—যাঃ, আমি আবার তোমাকে বোকা ভাবলাম কখন ?

—যদি না ভেবে থাকো এবার থেকে ভেবো। তুমি আমাকে বোকা ভাবলে খুব আনন্দ হয় আমার।

পদ্মিনী হাসতে হাসতে দুই অপরূপ বাহুদ্বারা স্বামীর গ্রীবাদেশ বেষ্টন করে। আর ভীম সিং আধো আলো আধো আঁধারে সেই সৌন্দর্য ভরা মুখের পানে তন্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বন্দীশালায় জগত সিং এর ঘুম ভেঙ্গে যায় ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই একে বন্দীশালা না বলে বিশেষ এক ধরনের তৈরী মজবুত একটি কক্ষ বলাই ভাল। কারণ সাধারণ অপরাধীদের যেখানে কয়েদ করে রাখা হয়, এটি সেখানে নয়। তাছাড়া অন্য কোন বন্দীও চোখে পড়ে না।

রাতে জগত সিং ভাল খাদ্য পেয়েছিল। তার বাবা নিজের হাতে যে ধরনের রুটি তৈরী করতেন ঠিক সেই রকম। খেতে বড় ভাল লেগেছিল। ব্যবহারও পেয়েছে সুন্দর। বাদল নিজে এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছিল। তবে কথা বলে নি একটিও।

জগত সিং শয্যা ছেড়ে উঠে বসে। ভাবতে থাকে নানা কথা। গতকাল সে দেখেছে প্রতিটি রাজপুতের দেহে কঠোর পরিশ্রমের সুস্পষ্ট ছাপ। পরিশ্রম না করে উপায় নেই এদের। মেবারের চাষের জমি তেমন উর্বর নয়। জলের প্রাচুর্য মোটেও নেই। দিল্লী থেকে আসার আগে সব কিছু লক্ষ্য করতে করতে এসেছে সে। শীতের শস্যের চাষ শুরু হয়েছে নানা জায়গায়। কত কষ্ট করে ফসল ফলাচ্ছে এ-দেশের মানুষ। এদের দেহ দিল্লীর নাগরিকদের মত পেলব হবে কি করে? মেদের চিহ্ন মাত্র নেই কারও দেহে। পরিশ্রমবিমুখ হবার সুযোগ নেই এদের। তাতে অনিবার্য মৃত্যু।

তবু আলাউদ্দিন যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ওপর সামলাতে পারবে কি? মনে হয় না। কারণ মেবারের ঐশ্বর্য তেমন নেই। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম হাতি ঘোড়া এবং উট খুব বেশী আছে বলে তো মনে হয় না। থাকলেও, কত বা থাকতে পারে। দিল্লীর সুলতানের তুলনায় নিশ্চয় নগণ্য। তাছাড়া সুলতান যদি দিনের পর দিন চিতোরকে ঘিরে অবরোধ চালাতে থাকে, তাহলে উপায় কি হবে? এদের শস্যভাণ্ডারে কত শস্য মজুত থাকতে পারে?

হ্যাঁ। তবে একটা মূলধন এদের রয়েছে বটে। সেই মহামূল্য মূলধনকে পৃথিবীর সবাই ভয় পায়। তাই মেবার অভিযানের আগে দিল্লীর সুলতানকেও অনেকবার ভাবতে হবে। এই মূলধন হল বীরত্ব আর দেশপ্রেম। সুলতান আলাউদ্দিন স্বাভাবিক মন নিয়ে এই রাজ্য হয়ত কোনদিনই আক্রমণ করতে সাহসী হত না। কিন্তু এখন সে উন্মাদ। রূপের নেশায় উন্মাদ। তার ভেতরের অতলান্ত লালসা আর কামনা তাকে অস্থির করে তুলেছে। কিংবা লালসা নাও হতে পারে। একটা প্রচণ্ড জেদ তাকে মেবার আক্রমণে প্ররোচিত করছে। জেদটি হল, বিশ্বের সেরা সুন্দরী থাকবে তারই হারেমে—অন্য কোথাও নয়। সেই রূপসুধা পানের অধিকারী একমাত্র সে।

বাইরে কিছু লোকের সাড়া পাওয়া যায়। জগত সিং প্রস্তুত হয়ে নেয়। এবারে তাকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে মেবারের রাজসভায়—রাণার কাছে।

দ্বার খুলে যায়। একজন রক্ষী সকালের খাবার এনে সামনে রাখে।

জগত সিং প্রশ্ন করে,—এ সব কে খাবে?

আপনার জন্যে এনেছি।

—সকালে উঠে হাত মুখ পর্যন্ত ধুতে পারলাম না। কি করে খাই?

রক্ষী বলে, - আসুন আমার সঙ্গে।

জগত সিং বাইরে যায়। দেখতে পায় এদিক ওদিক আরও তিন চারজন সশস্ত্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভালভাবে দেখে নিয়ে বুঝতে পারে, সত্যিকারের গুপ্তচর হলেও সে পালাতে পারত না।

কিছুক্ষণ পরে এসে খাবার খেতে বসে সে। বেশ খিদে পেয়েছিল। গরম রুটি আর তরকারী ভাল লাগে খেতে। ঘি মাখানো। সযত্নে তৈরী। অদূরে রক্ষী দাঁড়িয়ে তার খাওয়া দেখছে।

খাওয়া শেষ হতেই রক্ষী প্রশ্ন করে, আরও রুটি আনব?

জগত সিং বলে,—এর পরে দুপুরে যদি খেতে দাও, তাহলে দরকার নেই। এটা কি জলখাবার?

ঠিক সেই মুহূর্তে বাদল এসে উপস্থিত হয়। বলে, - কেন, দিল্লীতে এ-সময়ে দুপুরের খানা খায় নাকি?

—না। তবে আমাকে গুপ্তচর বলে বন্দী করেছেন। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। তাদের প্রতি ব্যবহার অন্যরকম হয় কিনা।

-- গুপ্তচরদেরও শুকিয়ে রাখা হয় না এখানে। অবিশ্যি যতক্ষণ সে বেঁচে থাকে।

জগত সিং মৃদু হেসে বলে,—খুব ভাল ব্যবস্থা। আপনারা মহানুভব।

– ঠাট্টা করছ?

—না। রাজপুতরা শুনি অতিমাত্রায় মহানুভব। এই মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে অনেক ক্ষতিসাধন করা যায়। তাছাড়া আপনাদের রক্ষীদের ভাং, সিদ্ধি এসব খাওয়া অভ্যাস আছে দেখলাম। সারারাত ঝিমোয়। তেমন চেষ্টা করলে একদিনে না হোক, দু'চারদিন বাদে পালাতে পারা যায়।

বাদলের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে কথাটা শুনে। সে বলে,—অনেক হয়েছে! এবারে চল আমার সঙ্গে।

—চলুন। কিন্তু আমার তলোয়ার? কাল আপনি নিয়ে নিয়েছিলেন। এখন ফেরত দিন।

—গুপ্তচরের হাতে অস্ত্র দেখ ? দিল্লীতে এ-প্রথা আছে নাকি ?

—ও। চলুন।

বাদল ওকে নিয়ে যায় রাজসভার দিকে। কাল রাতে জগত সিং বুঝতে পারেনি চিতোর দুর্গের পাশেই তাকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। আজ দিনের আলোয় সব স্পষ্ট হয়। চারদিক ভালভাবে দেখতে দেখতে চলে সে। পাহাড় বেয়ে এই দুর্গে উঠে আসতে যথেষ্ট হিম্মতের প্রয়োজন। সেই হিম্মত থাকতে পারে একমাত্র দিল্লীর সুলতানেরই। আর কারও নয়। এবং সেই সুলতান অন্য কেউ নয়, স্বয়ং আলাউদ্দিন হওয়া চাই।

তাকে রাজসভার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিল্লীর দরবারের মোটামুটি একটা আড়ম্বর রয়েছে। যদিও জাঁকজমক তেমন কিছু নেই। তবু সেটা যে দরবার কক্ষ একদৃষ্টিতে দেখে সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু চিতোরের রাজসভা সেই তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পোষাকের চাকচিক্য একেবারে নেই।

বাদল জগত সিংকে থামতে বলে। জগত অদূরে দুটি পাশাপাশি সিংহাসনের ওপর রাণা লক্ষ্মণ সিং ও তার খুল্লতাত ভীম সিংকে উপবিষ্ট দেখে। সে অভিবাদন জানায়।

সভার মধ্যে একটা মৃদু হাস্য রোল ওঠে। একটু হকচকিয়ে যায় জগত সিং। পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। তার সামনে সুলতান কিংবা কোন আমীর বসে নেই। অভিবাদনটি হওয়া উচিত ছিল হিন্দু রীতি অনুযায়ী। কিন্তু সে জানে না সেই রীতি। দু-হাত সামনে তুলে নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নত করলেও হত। তবে সেটাও সঠিক কিনা তার জানা নেই।

বাদল গম্ভীর হয়ে বলে—মহারাণা লোকটির প্রথম আবির্ভাবেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে কোন্ দেশ থেকে আসছে এ। আমার তো মনে হয় এ একজন পাঠান। রাজপুতের ছদ্মবেশ নিতে চেষ্টা করেছে।

রাণা লক্ষ্মণ সিং একবার ভীম সিং-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে। ভীম সিং তাকে কথা বলার অনুমতি দেয়।

রাণা প্রশ্ন করে,—বন্দী, তুমি কি রাজপুত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাণা।

রাণা তখন সভায় উপস্থিত বৃদ্ধ বাবারাম সিংকে ইঙ্গিতে বলে জেরা চালিয়ে যেতে।

বাবারাম জগত সিংকে বলে,—এদিকে তাকাও যুবক।

জগত সামান্য একটু ঘুরে দাঁড়ায়।

—তুমি হিন্দু রাজপুত বলে পরিচয় দিচ্ছ। অথচ মহারাজকে কিভাবে অভিবাদন জানাতে হয় জান না?

—না। দিল্লীর সুলতানের অধীনে আমি চাকরী করতাম। সেখানকার আদব-কায়দায় আমি অভ্যস্ত। এখানকার রীতি নীতি জানা নেই আমার।

—ও তাই নাকি? দিল্লীর সুলতানের চাকরী করতে? কী চাকরী?

—আমি সেখানে সিপাহী ছিলাম।

—সিপাহী? চমৎকার। আর সেখানে যাবে না?

—না।

—কেন? অসুবিধা না হলে বলবে কি?

বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই। সেই কথা বলার জন্যেই আমি চাকরী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। ফিরে যাবার জন্যে তো আসিনি।

বাবারাম একটু ভেবে নিয়ে বলে—হুঁ। কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি রাজপুত।

আমি রাজপুত। এই চিতোরেই আমাদের বাড়ি এখনো টিকে রয়েছে হয়তো। কিংবা চোদ্দবছর আগে কোন এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

—চিতোরে? বল কোথায় বাড়ি?

—জানি না।

বাবারাম মৃদু হাসে। সেই সঙ্গে সভাগৃহে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। বিদ্রুপাত্মক দু-একটি মন্তব্যও কানে ভেসে আসে। বলাই বাহুল্য রাণা ও ভীম সিংও এই মন্তব্য শুনতে পায়।

বাবারাম বলে,—অথচ তুমি পরিষ্কার বলে দিলে তোমার বাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ। বাবার কাছে শুনেছিলাম—স্পষ্ট মনে নেই।

এবারে লক্ষ্মণ সিং বলে—তোমার কথায় আস্থা-স্থাপনের বিন্দুমাত্র উপায় নেই যুবক।

জগত সিং মরিয়া হয়ে বলে ওঠে—অথচ মহারাণা, আমার পিতা মেঘ সিং আপনাদেরই সেবা করে গিয়েছেন, যতদিন এখানে ছিলেন।

মেঘ সিং। সবার মুখে নামটি ঘোরাফেরা করে। নামটা জানা। বৃদ্ধ বাবারাম কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে।

একজন বলে ওঠে অবশেষে,—কোন্ মেঘ সিং?

—এখানে কতজন মেঘ সিং ছিলেন বা আছেন জানি না। তবে আপনারা একজন মেঘ সিংকে হয়ত চিনবেন যাঁকে বাবারাম সিং নামে কোন সৈনাধ্যক্ষ ঈর্ষা করতেন যে কোন কারণে হোক। সেই ঈর্ষা এত ঘৃণ্য রূপ নিয়েছিল যে আমার পিতা বাধ্য হয়ে চিতোর ছেড়ে চলে যান দিল্লীতে। বাবারাম সিং এখনো বেঁচে আছেন কিনা জানি না। থাকলে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

সভাস্থল স্তব্ধ। রাণা নীরব। শুধু তার পাশে উপবিষ্ট ভীম সিংকে রীতিমত বিচলিত দেখা যায়। সে গম্ভীরভাবে ডাকে—বাবারাম সিং।

জগত সিং বিস্মিত নয়নে দেখে, এতক্ষণ যে তাকে জেরা করছিল সেই বৃদ্ধই উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে মুখে উদ্‌ভ্রান্তের ভাব।

—বাবারাম সিং, তুমি আমাকে কী বলেছিলে?

সব কয়টি চোখে অদম্য কৌতূহল নাটকীয়তার প্রত্যাশায়। এই অচেনা যুবক আর কিছু না হোক সুন্দর একটি কৌতূহলোদ্দীপক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

বাবারাম ধীরে ধীরে বলে—এতদিন পরে আমার ঠিক স্মরণে নেই।

—তোমার স্মৃতিশক্তি অত ক্ষীণ নয়। মেঘ সিংকে মহারাণার হয়ত মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে। সে ছিল বীর, সে ছিল বিশ্বস্ত। তুমি ক্রমাগত তার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে আমার মনকে বিষিয়ে তুলেছিলে। ফলে, তার দুর্গের চাকরী গেল। তারপরে একদিন তার বাড়িতে আগুন লাগল। তুমি বলেছিলে সেই আগুনে মেঘ সিং আর তার বালক পুত্র পুড়ে মরেছে।

—আমি মিথ্যা বলিনি। তার সাক্ষী এই সভাতেই আছে।

—কে সেই সাক্ষী?

—শম্ভু সিং।

এবারে শম্ভু সিং উঠে দাঁড়ায়। সে বলে—আমি মিথ্যা বলেছিলাম রাণা। মেঘ সিং মরেনি। তার বাড়ীতে আগুন লাগবে এই খবর কোনরকমে জানতে পেরে আগেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। সে একমাত্র পুত্রকে বুকে নিয়ে পালিয়েছিল। মেঘ সিং আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

ভীম সিং ক্রোধে জ্বলে ওঠে। বলে আগুন তাহলে লাগানো হয়েছিল। হুঁ। এ কথা আমাকে বলনি কেন?

—বাবারাম সিংএর ভয়ে। আপনি যতদিন রাণার নামে দেশ শাসন করেছিলেন ততদিন বাবারাম সিংএর ছিল প্রবল প্রতাপ। নইলে সেই দিনই বলতে পারতাম মেঘ সিং নির্দোষ। তার একমাত্র দোষ, বাবারাম সিংকে যে

রূপবতী নারী প্রত্যাখ্যান করেছিল মেঘ সিংকে সে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিল স্বামী হিসাবে।

গুপ্তচর বলে একজনকে রাজসভায় হাজির করে এ ধরনের কাণ্ড ঘটবে কে জানত? ক্ষোভে ভীম সিংএর মুখ অন্যরকম দেখায়। শুধু বলে—আমার বলার কিছুই নেই। তবে এইটুকু প্রমাণ হল, লক্ষ্মণ সিং রাণার কাজ বুঝে নেওয়ায় দেশের মঙ্গল হয়েছে। আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

শম্ভু সিং তাড়াতাড়ি বলে ওঠে না। আপনার করার কিছুই ছিল না। বাবারাম সিং খুবই উপযুক্ত ব্যক্তি। এখনো তাঁর পরামর্শের যথেষ্ট মূল্য। শুধু ব্যক্তিগত ওই দুর্বলতা ছাড়া তাঁর আর কোন দোষ নেই।

—ব্যক্তিগত আক্রোশ একজন বীর, বিশ্বাসী, দেশপ্রেমিকের নির্বাসনের কারণ হলে সব গুণই নষ্ট হয়ে যায়। বাবারাম সিং এখন বৃদ্ধ। আমি মহারাণাকে শুধু এটুকুই পরামর্শ দিতে পারি রাজসভায় তার স্থান আর একদিনও হওয়া উচিত নয়।

রাণা লক্ষ্মণ সিং ঘাড় হেলিয়ে খুল্লতাতের কথায় সায় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাবারাম সিং মহারাণাকে অভিবাদন জানিয়ে অবনত মস্তকে দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়। বার্ধক্যের ভারে এবং সম্মান খুইয়ে সঙ্কোচে তার দেহ কাঁপতে থাকে। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামে। অন্যেরা নির্বাক। তাদের মনে দ্বন্দ্ব চলে। বাবারামকে তারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। অথচ অতীত দিনের এই কলঙ্ক সেই শ্রদ্ধাকে চূর্ণ করে দিতে বসেছে। সহানুভূতি শুধু তার বয়সের জন্য আর তার অবমাননাকর বাকী দিনগুলোর কথা ভেবে।

শম্ভু সিং অপরাধবোধে পীড়িত হতে থাকে। প্রথম অপরাধ, যথেষ্ট সাহসী সে ছিল না বলেই বাবারামের অন্যায় প্রকাশ করতে পারেনি। তার দ্বিতীয় অপরাধ, বাবারামের সেই প্রতিপত্তি নেই বলেই আজ সবার সামনে তাকে অপাংক্তেয় করতে পারল। কিন্তু করার কিছু ছিল না তার। মেঘ সিং-এর নাম তাকে যথেষ্ট বিচলিত করে তুলেছিল। চিন্তা করার অবকাশ পায়নি। সামনের যুবক সেই মেঘ সিং-এরই পুত্র, যাকে কত ছোট দেখেছিল সে। তবে আরও প্রমাণ চাই। এই যুবক প্রতারকও হতে পারে।

সে ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে বলে—মহারাণা, আমি এই যুবককে কয়েকটি প্রশ্ন করার অনুমতি চাইছি।

—বেশ।

শম্ভু সিং বলে—তোমার নাম?

—জগত সিং।

শম্ভু সিং একটু ভেবে নিয়ে বলে—মনে করতে পারছি না সেই শিশুটির নাম। যাহোক, তোমার বাবার শরীর তোমার অপরিচিত থাকার কথা নয়। বলতে পারো, তাঁর দেহের কোথাও অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্ন ছিল কিনা?

জগত বলে তাঁর কপালের বাঁদিক থেকে সুরু করে কানের পাশ দিয়ে একটা কাটা দাগ ছিল।

—ঠিক। কিন্তু সে তো বাইরের চিহ্ন। জেনে নেওয়া কঠিন নয়। আর কিছু? অন্য কোথাও?

—তাঁর ডান উরুতে ছিল গভীর ক্ষত চিহ্ন। শিকারে গিয়ে বন্য বরাহের পেছনে যখন ছুটছিলেন তখন সম্ভবত বাবারামের বর্শা একটা ঝোপের আড়াল থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। তাতে তিনি সাংঘাতিক আহত হন।

ভীম সিং চেঁচিয়ে ওঠে—শম্ভু সিং?

শম্ভু সিং কাঁপা গলায় বলে—মেঘ সিং-এর এইরকমই সন্দেহ ছিল। সত্যি কিনা জানি না।

মহারাণা হাত তুলে বলে—আর প্রশ্নের কোন প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট হয়েছে।

সবার সহানুভূতি উপচে পড়ে যুবকের প্রতি। তাদের মধ্যে আফসোসের নানা ধ্বনি ওঠে।

মহারাণা বলে—জগত সিং, তুমি কি মেবারে থাকতে চাও বলে দিল্লী ছেড়েছ?

—আমার দিল্লী ছাড়ার গুরুতর কারণ রয়েছে মহারাণা। সেইজন্যেই ছুটে এসেছি। তবে আমি দেশের সেবাই করব। ওখানে আর ফিরব না।

—কেন দিল্লী ছাড়লে?

জগত সিং সভার প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে নেয়। তারপর বলে,—আমি কি কোন গোপন কথা এখানে প্রকাশ করতে পারি?

বিস্মিত মহারাণা বলে ওঠে,—গোপন কথা?

—হ্যাঁ মহারাণা। তবে একটা কথা গোপন নয়। সেটা হল, সুলতান আলাউদ্দিন খুব শিগ্‌গির মেবার আক্রমণ করবেন।

ভীম সিং এবং লক্ষ্মণ সিং ভ্রূ কুঞ্চিত করে। তারপর লক্ষ্মণ সিং বলে—এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ?

— হ্যাঁ মহারাণা। সেইজন্যে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আমাকে চলে আসতে হয়েছে।

—এতদিন পরে হঠাৎ কেন তাঁর চিতোর আক্রমণের কারণ ঘটল ?

— সেইটুকু গোপনীয়।

মহারাণা বাদলকে ইঙ্গিত করে। দেখা যায় রাণা এবং ভীম সিং উভয়েই গাত্রোত্থান করে।

বাদল জগত সিং-এর পিঠের ওপর আলগোছে হাত রেখে কানের কাছে মুখ এনে মৃদু কণ্ঠে বলে—ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বন্ধু। চল, পাশের ঘরে।

জগত সিং বাদলকে অনুসরণ করে পাশের কক্ষে প্রবেশ করে দেখে মহারাণা ও ভীমসিং দুটি আসনে বসে রয়েছে। বুঝতে পারে গোপন বিষয়ে আলোচনার জন্যেই রাজসভার সন্নিহিত এই কক্ষ।

জগত সিং অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে দিল্লী-দরবারের ঘটনার কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সে জানে তার কথায় এরা কতখানি অপমানিত বোধ করবে। সে জানে রাজপুত রমণীর সতীত্ব এবং তাদের পবিত্রতার প্রতি এরা কতটা শ্রদ্ধাবান। নিজেকে দিয়েই সে বুঝতে পারে। নইলে অজানা অচেনা জন্মভূমির দিকে কখনো সে রওনা দিত না।

ভীম সিং ক্রোধে কাঁপতে থাকে। রাণা লক্ষ্মণ সিং ফুঁসতে থাকে। কিন্তু খুল্লতাতের অবস্থা দেখে সে তাড়াতাড়ি তাকে চেপে ধরে বলে,—এ শুধু আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আপনিই যদি বিচলিত হয়ে পড়েন, তাহলে স্থির মস্তিষ্কে আমরা কিছুই করতে পারব না। আপনি শান্ত হোন।

জগত সিং স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ বাদলও তার মনের স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে।

অবশেষে মহারাণাই সবচেয়ে আগে নিজেকে সামলে নেয়। সে জগত সিংকে বলে, তুমি বিদেশে থেকেও মেবারের প্রকৃত সন্তানের কাজ করেছ। তুমি যথার্থ রাজপুত। তোমার ভিটে তোমারই হবে। আমি গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এ ক'দিন তুমি প্রাসাদে থাক। বাদল তোমার দেখাশোনা করবে।

বাদল যেমন মেবারে এসে রাজপুত হয়ে গিয়েছে, তার কাকা গোরাও তেমনি খাঁটি রাজপুত। সব গুণাবলীই তার রয়েছে। সে বীর, সে যোদ্ধা, রাজপুতের মহানুভবতাও তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। বয়স কম হলেও সম্পর্কে সেও পদ্মিনীর খুল্লতাত স্থানীয়। পদ্মিনীর সঙ্গে মেবারে আসতে প্রথমে তার অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন নিজের দেশে ফিরে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। তার ওপর একজন রাজপুতানী এখন তার স্ত্রী।

আলাউদ্দিনের মেবার আক্রমণের পরিকল্পনার কথা গোরা কদিন পরে জেনেছে। জগত সিং মেবারে পদার্পণ করার সময় সে অনুপস্থিত ছিল। রাজোয়ারার কোন এক স্থানে বিশেষ কাজে তাকে পাঠানো হয়েছিল।

ঘরে ফিরে স্ত্রীর মুখে কথাটা শুনে সে চিন্তিত হয়। তার স্ত্রী আলাউদ্দিনের আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু জানত না। এখনো পর্যন্ত সে কথা গোপনই রয়েছে। কিন্তু বাদল এসে সেদিন সন্ধ্যায় গোরাকে একান্তে ডেকে আসল কথা পরিষ্কার করে বলে যায়।

গোরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাদলের অনুরোধে কিছুটা শান্ত হয়ে বলে রাণা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

—তিনি চিতোর দুর্গের সমস্ত পথ সুরক্ষিত করার আদেশ দিয়েছেন। প্রাচীরের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখার গোপন পথটির সংস্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

—ভীম সিং কি বলেন ?

— তিনি কিছুই বলছেন না।

—স্বাভাবিক। তবে এভাবে চুপ করে থাকলে তো চলবে না। সর্দারদের ডেকে পাঠানো হয়েছে ?

—লোক গিয়েছে।

বাদলকে বিদায় দিয়ে গোরা বাইরে যাবার উদ্যোগ করে। বৃদ্ধ বাবারাম সিং এর কাছে একবার যেতে হবে। তার অভিমত জানতে হবে।

স্ত্রী কলাবতী এসে বলে,—কোথায় চললে ?

— একটু বাইরে।

—দশ দিন পরে ফিরলে আমাকে একবারও তো কাছে ডাকলে না ?

—কাছেই তো ছিলে।

– ও বুঝেছি।

—কী বুঝলে আবার ?

—আগ্রহ আর অনাগ্রহের তফাৎ বুঝতে আমাদের একটুও অসুবিধা হয় না।

গোরা হেসে বলে—জানি। তবে সব কিছু আজ রাতের জন্যে জমিয়ে রেখেছি সেকথা জানো ?

—ধেৎ।

—ধেৎ কেন ? আমি তোমাকে কাছে ডাকার সময় পেলাম কোথায় ? এক জনের পর একজন আসতে শুরু করল। কত লোক আমাকে ভালবাসে দেখতো ?

—তাই দেখছি। সেই জন্যেই ঘরের একজনের ভালবাসার কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে।

—বটে? দেখবে? দেখো তবে—

কলাবতী হেসে দূরে ছুটে যায়। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে কখন ফিরবে?

—বেশী দেরি হবে না। বাবারাম সিং এর ওখানে যাচ্ছি।

কলাবতী তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে আসে। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। বলে কার কাছে যাচ্ছ বললে?

—কেন? বাবারাম সিং।

কলাবতী আস্তে আস্তে বলে—তুমি কিছু জান না?

—কি জানব আবার?

—বাবারাম সিং এর কথা?

গোরা বিস্মিত কণ্ঠে বলে—না তো?

কলাবতী বাদলের মুখে যা শুনেছিল সব বলে।

গোরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে ভাবে, অতীতের চাপা পড়ে যাওয়া ঘটনা এতদিন পরে এভাবে উন্মোচিত হওয়া খুবই বিস্ময়ের। বাবারামের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। নইলে এই বয়সে এভাবে সে অপ্রয়োজনীয় বলে দূরে নিক্ষিপ্ত হত না। পাপের শাস্তি বড় দেরিতে পেল সে।

যার জন্যে বাবারামের আজ এই অবস্থা, তাকে দেখার কৌতূহল জাগে গোরার। সে গভীর নিশ্বাস টেনে বলে যাই, তবে সেই জগত সিংকেই দেখে আসি। আচ্ছা, রাণী পদ্মিনীর সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল তোমার?

—গতকালই তো দেখা করেছি।

—আলাউদ্দিনের কথা শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি রকম?

—কিরকম আবার? তিনিও আমাদের মতই শুনেছেন।

—সে কথা নয়। তাঁকে নিয়ে যে ধরনের নোংরা মন্তব্য করেছে আলাউদ্দিন, উরু চাপড়ে বলেছে, পদ্মিনীকে চাই-ই। এ কথা শোনার পরও কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি?

কলাবতী কেঁপে ওঠে। কথাটা প্রথম শুনল সে। বাদল গোপন করেছে তার কাছে। সবার কাছেই গোপন করেছে। নইলে তার কানে আসত।

গোরা স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারে ভুল করে ফেলেছে কোথাও। মস্ত ভুল। কলাবতী জানত না কথাটা। বাদল বলেনি কাউকে। তেমন

নির্দেশ রয়েছে নিশ্চয়। সেইজন্যেই বাদল আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে জানিয়েছিল সব।

সে কলাবতীর দুই কাঁধের ওপর দুই হাত রেখে বলে,—লক্ষ্মীটি, তুমি এ নিয়ে কাউকে কিছু বলতে যেও না।

কিন্তু কলাবতী নারী। গোরা চলে যেতেই সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। আলাউদ্দিন যেন রাজস্থানের প্রতিটি নারীর সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে চায়। তার অশালীন উক্তি প্রতিটি রাজপুত রমণীর পবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত বিশেষ। পদ্মিনী রাজপুত রমণীদের প্রতীক মাত্র।

কলাবতী আর স্থির থাকতে পারে না। তার মাথা গরম হয়ে উঠে। সারা গা ঘামে ভিজে যায়। স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী কথাটা সে বলতে চায় না কাউকে। কিন্তু উন্মাদের মত বহুক্ষণ ধরে পায়চারী করেও নিজেকে শান্ত করতে পারে না। ছুটে যায় পদ্মিনীরই আবাসে। তাকে অন্তত বললে ক্ষতি নেই। সে নিশ্চয় জানে সব। ভীম সিং কিছুই গোপন করে না তার কাছে। এই গুরুতর ব্যাপার তো লুকোনোর প্রশ্নই ওঠে না।

কলাবতী ঠিক স্বাভাবিক বেশবাশ আর ভঙ্গি নিয়ে পদ্মিনীর সামনে উপস্থিত হতে পারে না। তাই পদ্মিনীর চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে।

কলাবতীর হাত নিজের হাতে উঠিয়ে বলে—কী হয়েছে তোমার মা কলাবতী? অমন করছ কেন?

কলাবতী বয়সে পদ্মিনীর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট হলেও সম্পর্কে মাতৃস্থানীয়া বলে এ ভাবে সম্বোধন করে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কলাবতী বলে -আপনি কেমন করে শান্ত হয়ে আছেন আমাকে বলে দিন। আমি আর পারছি না। আমি সাধারণ স্ত্রীলোক। আপনার মত ধৈর্য আমার নেই।

পদ্মিনী সস্নেহে কলাবতীর মাথায় হাত রেখে বলে—ব্যাপারটা খুলে বল। আমি বুঝতে পারছি না।

এতক্ষণে কলাবতীর হুঁশ হয়। পদ্মিনীর চাহনি তাকে বলে দেয়, সে সত্যিই কিছু জানে না। উত্তেজনার বশে ভুল করে বসে আছে। যে কারণেই হোক ভীম সিং তার অতি আদরের বধূকে কথাটা বলেনি। এবারে কী করবে সে? এভাবে ছুটে এসে কিছু না বলেই চলে যাবে? এতে পদ্মিনীর সন্দেহ হবে। আর যদি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে দেয় তাহলে পদ্মিনীও তার মত জ্বলতে থাকবে। সেই সঙ্গে ভীম সিং এর সঙ্গে জীবনে বোধহয় প্রথম মনোমালিন্য দেখা দেবে।

তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হল, এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করা হবে তারই স্বামী গোরাকে।

দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে ভেতরে ভেতরে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে কলাবতী।

—বল মা কলাবতী। চুপ করে রইলে কেন?

—আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করলে কী উপায় হবে? সে নাকি খুবই পরাক্রমশালী।

—এরই জন্যে অস্থির হয়ে তুমি ছুটে এলে? ছিঃ, মা। তুমি না রাজপুত রমণী? তোমার মনে ভয়?

— ভয় আমার জন্যে নয়।

—তবে কি তোমার স্বামীর জন্যে? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে বলে? যৌবনের প্রথম প্রভাতেই সব বাসনা-কামনার সমাধি ঘটবে বলে?

—না না রাণী! তা নয়। আমার স্বামী আপনারই আত্মীয়। তিনি কত বড় বীর সেকথা আপনাকে বলে দিতে হবে না। আর যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিলে আমার কর্তব্যও জানা আছে। কোন্ রাজপুত গৃহিণীরই বা অজানা সে কথা?

—তবে? তবে এভাবে ছুটে এলে কেন? সাময়িক দুর্বলতা?

—তাও নয়।

—তবে কি?

পদ্মিনীর মুখে বিষাদ আর বিরক্তির ছায়া। কলাবতীর মনে হয় সে যেন অনেক নীচু হয়ে গেল। সে নীরব থাকে। তার ওপর পদ্মিনীর যে ধারণাই জন্মাক না কেন, এই মুহূর্তে সব কিছুকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

পদ্মিনী তীক্ষ্ণ তরবারির মত ঝলসে উঠে বলে,—যাও কলাবতী। ঘরে গিয়ে সুস্থির হও। আলাউদ্দিন কবে চিতোর আক্রমণ করতে আসবে এখন থেকে সেকথা ভেবে কেঁপে উঠে লাভ নেই। মনে রেখো, সেই আক্রমণে একা তোমার ভাগ্য জড়াবে না। মেবারে তোমার মত লক্ষ লক্ষ রমণী রয়েছে। তাদেরও স্বামী রয়েছে। পুত্রদের কথা ছেড়েই দিলাম। তোমাকে এত কথা বলা উচিত হচ্ছে না জানি। কারণ বয়সে ছোট হলেও তুমি আমার গুরু স্থানীয়া।

—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

পদ্মিনীর মুখে অদ্ভুত ধরনের এক হাসি ফুটে ওঠে। সে ইঙ্গিতে কলাবতীকে চলে যেতে বলে। তার সঙ্গে কথা বলার ধৈর্য্যও বোধহয় নেই আর।

বাদল প্রবেশ করে সেই মুহূর্তে। কলাবতীকে দেখে সামান্য অবাক হয়ে বলে — তুমি এখানে কাকীমা?

—হ্যাঁ বাদল।

পদ্মিনী বলে,—মায়ের বড় ভয় বাদল। আলাউদ্দিন এলে ওর স্বামীকে যে যুদ্ধে যেতে হবে।

বাদল ভাবে পদ্মিনী রসিকতা করছে। কলাবতীকে সে ভালভাবেই জানে। ভয়-ভীতি তার মধ্যে নেই। সে হেসে ওঠে তাই।

পদ্মিনী কঠিন স্বরে বলে,—হাসির কথা নয় বাদল। মাকে প্রশ্ন করতে পার।

বাদলের মনে চমক জাগে। সে কলাবতীর দিকে ফিরে বলে, তাই ?

কলাবতী অসহায়। কান্নাই বোধহয় এ সময়ে একমাত্র সম্বল। কিন্তু সে স্থির। শান্ত কণ্ঠে বলে,—রাণী আমাকে ভুল বুঝেছেন বাদল। দোষ আমারই।

পদ্মিনী বলে শোন কলাবতী। তোমার এই দুর্বলতা ক্ষণিকের। আমি বিশ্বাস করি একথা। এর জন্যে -

কলাবতী এবারে বেশ দৃঢ়স্বরে বলে,—কোন দুর্বলতা আমার মনে ঠাঁই পায় না কখনো।

যে-কথা বলার জন্যে মহারাণা এবং ভীমসিং একত্রে পরামর্শ করে বাদলকে পদ্মিনীর কাছে পাঠিয়েছে এতক্ষণ তা বলার অবকাশ পায়নি সে। কিন্তু কলাবতী এবং পদ্মিনীর মধ্যে কথা বার্তার ধরনে সে বিস্ময় বোধ করে। কারণ সম্পর্ক তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বাদল খুবই বিড়ম্বিত বোধ করে। সে ভাবে, এই সময়ে কথাটা বলে ফেললে সব দিক দিয়ে ভাল হবে।

বাদল পদ্মিনীকে বলে -আমাকে মহারাণা পাঠালেন আপনার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর জানাতে। খবরটি কয়েকদিন চেপে রাখা হয়েছিল রাণার আদেশে। আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল। মেবারের প্রতিটি মানুষের জানার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তাতে সবার মনে যে দাবানলের সৃষ্টি হবে, তাতে দিল্লীর সুলতান পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পদ্মিনী বাদলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবে, কী এমন কথা যা তার কাছেও প্রকাশ করা হয়নি ?

বাদল আগে থেকে ঠিক করেই এসেছিল, দূতেরা যেমন নির্বিকার হয়, তাকেও সেরকম হতে হবে। সে পদ্মিনীর দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দিল্লীর দরবারের ঘটনার কথা একে একে বলে যায়। এমনভাবে কথাগুলো বলে যে মনে হয়, তার অর্থ সে বোঝে না। এমন কি কথাগুলি যে যে শব্দ দিয়ে তৈরী সেগুলোও তার অজানা।

পদ্মিনীর মুখ সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে ওঠে। সামনের দোদুল্যমান টিয়ে পাখীর খাঁচাটিকে সে সজোরে চেপে ধরে। সেটি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। টিয়ে পাখীও বুঝতে পারে তার বিপদ। অতি প্রিয় পদ্মিনীর হাতকে রেহাই দিতে ভুলে গিয়ে ঠুক্‌রোতে থাকে। ব্যথার অনুভূতি থাকে না পদ্মিনীর। সে পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

কলাবতী বলে—আপনিও তাহলে বিচলিত হলেন রাণী। আপনি তো আমার মত সাধারণ রমণী নন।

বাদল চেঁচিয়ে ওঠে,—কি বললে? তুমি জানতে এসব কাকীমা?

—হ্যাঁ বাদল। কথাটা যে প্রাসাদেও গোপন রয়েছে তোমার কাকা বোধহয় সেকথা জানতেন না। যার জন্য বলে ফেলেছিলেন আমাকে। পরে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমিও সেই একই ভুল করে বসলাম। ভেবেছিলাম, যাঁকে ঘিরে এতকাণ্ড, তিনি নিশ্চয় জানেন। কিন্তু এসে দেখলাম তা নয়। তাই এতক্ষণ ধরে ওঁর তিরস্কার আর অপবাদ সহ্য করে শেষে একটু উষ্ণ কথা বলে মনে মনে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি।

পদ্মিনী দুবাহু বাড়িয়ে কলাবতীকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলে আমায় ক্ষমা কর মা। তুমি জ্বলে পুড়ে মরছিলে। আমি বুঝতে পারিনি।

কলাবতী পদ্মিনীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে – পদ্মিনী শুধু ভীম সিংএর পত্নী নন। তিনি হলেন মেবারের প্রতিটি রমণী। একথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলবেন না।

বাদল সপ্রশংস দৃষ্টিতে কলাবতীর দিকে চেয়ে থাকে।

চিতোর দুর্গের পেছন দিকে রয়েছে একটি বহির্গমনের পথ। এই পথে মহারাণা স্বয়ং কিংবা রাণা বংশের অন্য কেউ গোপনে পুরী ত্যাগ করে রাজ্যের অবস্থা নিজে যাচাই করে নিতে পারেন। মহারাণারা বহুবার এই পথ দিয়ে ছদ্মবেশে রাতের অন্ধকারে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আবার ভোরের আগে ফিরে এসেছেন। অনেক সময় প্রমোদ ভ্রমণের জন্যেও এই পথ ব্যবহৃত হয়েছে।

সেদিন রাতে প্রাসাদের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দুটি প্রাণী ধীরে ধীরে নেমে এল প্রাঙ্গণে। প্রথমে তারা চুপিচুপি অশ্বশালায় গিয়ে দুটি ঘোড়া বেছে নেয়। বাইরে কড়া পাহারা থাকলেও এখানে কোন সতর্কতার ব্যবস্থা নেই। কারণ প্রয়োজন হয় না। ঘোড়া দুটিকে নিয়ে তারা এগিয়ে গেল সেই গোপন পথের দিকে।

আলো নেই কোথাও। শুধু মাথার ওপরে মেঘহীন আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ। স্নিগ্ধ আলোর বন্যা প্রাঙ্গণে—প্রাসাদের বহিরঙ্গে। অন্দরের উদ্যানের বড় বড়

গাছগুলির পাতা চুইয়ে সেই আলো যেন ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়েছে শিউলি ফুলের মত।

ঘোড়া দুটির পায়ের মৃদু খটখট শব্দ। তাতেই তারা দুজনে চমকিত। হাত-পা নেড়ে উভয়ের মধ্যে ফিসফিস কথা হয়। জ্যোৎস্নায় আলোয় যতটুকু বুঝতে পারা যায়, উভয়েই তরুণ। মাথায় শিরস্ত্রাণ। একজনের কটিদেশে ঝুলন্ত তলোয়ার, অপরে অস্ত্রহীন।

গোপন পথের দ্বারদেশে সজাগ প্রহরী। তরুণদের একজন তার কাছে গিয়ে কিছু বলতেই সে বিনা দ্বিধায় দ্বার খুলে দেয়। উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে প্রাসাদের বাইরে এসে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সমতলের একটি স্থানে এসে উভয়ে ঘোড়া থামায়। একজন তরুণ চটপট লাফিয়ে নীচে নামে। অপর জন চুপচাপ ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন প্রথম তরুণ এগিয়ে যেতেই দ্বিতীয় জন তার গলা জড়িয়ে ধরে।

—এই জন্যেই অপেক্ষা করছিলে? আগে জানলে একটা ঘোড়ায় চেপে আসতাম দুজনা দুটো ঘোড়ায় না চেপে।

—ইস্ কি বুদ্ধি। প্রহরী কি ভাবত তাহলে?

—তাও তো বটে।

সে অপর জনকে কোলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে একটি উঁচু ঢিবির ওপর বসে। তারপর তার মাথায় শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সাপের ফণার মত দীর্ঘ রেশমী চুল ছড়িয়ে পড়ে যুবকের বুকে মুখে।

—খুলে ফেললে?

- হুঁ। নইলে তুলনা করব কি করে?

— কার সঙ্গে? কিসের তুলনা?

- ওই আকাশের চাঁদের সঙ্গে? তোমার এই মুখখানার?

তরুণটি গোরা। তার অঙ্গে অর্ধশায়িত অবস্থায় কলাবতী। গোরার মুখ নেমে আসে।

কলাবতী প্রতিরোধের ভান করতে গিয়েও পারে না। সে অত্যন্ত বিমুগ্ধ নয়নে তার তেজোদ্দীপ্ত স্বামীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আর গোরা? তারও নয়নে ছিল মুগ্ধতার সঙ্গে আবেশ। এই সম্পূর্ণ অভিনব পরিবেশে সে কলাবতীকে প্রথম দেখল। দেখতে দেখতে কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। সেই উন্মত্ততার ছোঁয়াচ ধীরে ধীরে সংক্রামিত হতে থাকে কলাবতীর মধ্যেও।

—তুমি কি করছ আমাকে নিয়ে?

—আমি ? জানি না তো ? দাঁড়াও, আগে তোমাকে নিয়ে একটু ছুটব ?

—যদি পড়ে যাই ?

—অতই সহজ ? এই গোরা এখন মেবারের বীরদের অন্যতম।

গোরা সত্যিই কলাবতীকে নিয়ে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে তাকে শুইয়ে দেয়।

কলাবতীর সমস্ত শরীর অবশ। সে তেমনি শুয়ে থাকে। শুধু বলে- এবারে কি করবে ?

গোরা বলে,—আমিও তোমার পাশে শোব।

গোরা শুয়ে পড়ে দুই হাতের ওপর ভর রেখে কলাবতীর মুখের দিকে ঝুঁকে।

কলাবতী অস্ফুট স্বরে বলে,—এবারে ?

—এবারে ? এবারে প্রতিহিংসা।

—কিসের প্রতিহিংসা গো ?

—ওই যে তুমি বলেছিল, আমি তোমাকে ভালবাসি না। আমি কি বলে-ছিলাম মনে আছে ?

—কি ?

—বলেছিলাম, শোধ তুলব। এখন সেই সময় এসেছে।

—শোধ তুলতে এত দেরি করছ কেন ? আমি আর পারছি না।

সেই সময় একখণ্ড মেঘ ক্ষণকালের জন্যে চাঁদকে আবৃত করে। বহু দূরে কোথাও গাছে পাখী ডেকে ওঠে ভোর হয়েছে ভেবে। জ্যোৎস্না তাদের মনে এনেছে বিভ্রান্তি।

অনেক পরে গোরা ডাকে—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

—ক্ষতি কি ? বেশ হতো, যদি এভাবে ঘুমোতে পারতাম।

—চল। ঘোড়া দুটো আমাদের পাগল ভাবছে।

কলাবতী হেসে ওঠে।

গোরা বাদলের মুখে শুনেছিল, পদ্মিনীর কাছে কলাবতীকে অপদস্থ হতে হয়েছে, ভুল বোঝাবুঝির দরুণ। তবে কলাবতী স্বামীকে মুখ ফুটে সেকথা বলেনি। ব্যথায় ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল গোরার। সে ঠিক করেছিল, আজই রাতে কলাবতীকে একটু আনন্দ দেবার চেষ্টা করবে। তারপর ভেবে ভেবে, শেষে রাতের এই যুগ্ম অভিসারের কথা মাথায় এসে গেল।

কলাবতীর হাসি দেখতে দেখতে সে ভাবে এই হাসিতে পৃথিবীর কিছু মাত্র কলুষতাও স্পর্শ করেনি। এই হাসি স্বর্গীয়। আর এই হাসির ভেতর দিয়ে

ফুটে উঠেছে প্রগাঢ় প্রেম। সে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবে।

জগত সিং স্বদেশ কাকে বলে জানত না। দিল্লীতে তার দোস্ত ছিল। সবার সঙ্গে মেলামেশা ছিল। আনন্দও ছিল অঢেল। অভাব বোধ বলতে কিছু ছিল না।

মেবারে এসে সে প্রথম বুঝতে পারে, এতদিন সে ছিল অসম্পূর্ণ এক মানুষ। তার হৃদয়ের এক বিরাট অংশ শূন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। অথচ এই শূন্যতার অনুভূতি ছিল না। আজ সেই শূন্যতা স্বদেশ প্রীতির মধুতে পরিপূর্ণ। আর সেই সঙ্গে এসেছে এক দায়িত্ববোধ। সে বুঝতে পারে একেবারে পালটে গিয়েছে সে। দিল্লীর সুলতানের অধীনে কর্মরত যে কোন সিপাহীর চেয়ে এখানকার সামান্যতম একজন কর্মচারীর সেইখানেই মূলগত পার্থক্য।

জগত সিং আনন্দিত। আনন্দের তীব্রতা এক একসময় তাকে বিহ্বল করে দেয়। কী করবে ভেবে পায় না। সারা চিতোরের পথঘাট টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যেচে আলাপ করে। সম্ভব হলে তার কোন উপকার করে দেবার চেষ্টা করে। রাস্তাঘাটে গরু কিংবা ষাঁড়কে দুল্‌কি চালে চলতে দেখলে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করে। ঘোড়া বাঁধা থাকতে দেখে পিঠে চাপড়ে দেয়।

ইতিমধ্যেই সে অনেকের পরিচিত এবং কিছু লোকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার বাবাকে যারা চিনত তাদের অনেকে দেখা করে। অধিকাংশই প্রবীণ। বাবার সুখ্যাতি তাদের মুখে শুনতে বড় ভাল লাগে।

সবই ভাল। শুধু একটি জিনিস সে ঠিক সইতে পারে না। মেবারের অধিকাংশ মানুষই নিয়মিত ভাঙ-সিদ্ধি খায়। সিদ্ধি এমনকি আফিম এখানকার মানুষের সামাজিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দিল্লীতেও সে অনেককে এই নেশা করতে দেখেছে। তবে এত ব্যাপকভাবে নয়। সেখানে সিদ্ধি হল নিছক নেশার সামগ্রী। আর এখানে সেটি প্রায় পবিত্রতার বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলা কিংবা রাতের কথা দূরে থাক, দিনে দুপুরে যখন তখন এরা নিয়মিত জিনিসটি সেবন করে।

কত সময় সে দেখেছে চিতোরের প্রাকারের ওপর পাহারারত সৈনিক বসে বসে ঢুলছে। এই ঢুলুনি কারও চোখে বিসদৃশ ঠেকে না। এসব ভাল লাগে না জগত সিং এর। অথচ একথা বলতে সাহস হয় না কাউকে, বিশেষত বাদলকে। রাণাকে বলা তো দূরের কথা। কারণ দুদিন আগে একজন উপজাতি সর্দারকে মহারাণা নিজেই হেসে প্রশ্ন করলেন, আপনার সিদ্ধি সেবন হয়েছে? সর্দার

জবাব দেয়, হ্যাঁ মহারাণা। সুতরাং এর মূল অনেক গভীরে। দোস্তি করতে কিংবা কোন কিছু ব্যাপারে একমত হলে ডানহাত মেলাতেই একদিন সে অভ্যস্থ ছিল। অনেক সময় শিরস্ত্রাণ পরিবর্তণ করতেও দেখেছে সে পরস্পরের মধ্যে। কিন্তু এখানে দুজনে একত্রে সিদ্ধি খেতে বসে যায়।

তবু মেবার তার অতিপ্রিয়। দোষে গুণে মেবার তার কাছে স্বর্গ। এতদিন এই স্বর্গ-স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত ছিল।

বাদলের উৎসাহে আর রাণার আনুকূল্যে তার পৈতৃক ভিটায় ঘর উঠেছে। ঘর বাঁধার ইচ্ছা তার বিশেষ ছিল না। তাই একখানা মাত্র ঘরের কুটির তৈরী করে নিয়েছে।

বাদল হেসে বলেছিল - সংসার বাড়লে ?

—বাড়বে না।

আসলে আলাউদ্দিনের আক্রমণের ফলাফল না দেখা অবধি জগত সিং স্বস্তি পাবে না। দিল্লীর শক্তি সম্বন্ধে সে যতটা ওয়াকিবহাল এরা ততটা নয়। এরা নিজেদের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে অত্যন্ত আস্থাশীল। কিন্তু শৌর্যবীর্য ছাড়াও আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে। সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে এক-বার অভিযানে গিয়েই তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে।

তার কুটিরখানি তৈরী হওয়ায় সে আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতে পারেনি। মাথায় তার অন্য চিন্তা। সে চিতোরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করে দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে থাকে প্রায় প্রতিদিনই অনেকক্ষণ ধরে। কোন একদিন নিশ্চয় দেখতে পাবে ওই দূরে তৃণহীণ প্রান্তরের সীমারেখায় ধুলোর ঝড় উঠেছে। কিন্তু সেটি ঝড়ও নয় পঙ্গপালও নয়।

রাণা ইতিমধ্যে সাধারণবেশে দুজন অশ্বারোহীকে পাঠিয়েছেন মেবার সীমান্তে। তারা ছুটে এসে খবর দেবে। তবু জগত সিং নিশ্চিত হতে পারে না। কোন কারণে তারা দুজনা একসঙ্গে বসে যদি সিদ্ধি সেবন সুরু করে দেয় তাহলে সর্বনাশ। শৌর্য বীর্য আর দেশপ্রেমও নেশার কাছে বিলীন হয়ে যায়।

প্রাকারের পাশে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে চেয়েছিল সেদিন। মন কিন্তু নানান চিন্তায় বিভোর। বাবারামের কথা একসময় ভাবতে শুরু করে। লোকটি তার বাবার জীবন পর্যন্ত নিতে চেয়েছিল। বাবার সঙ্গে তাকেও মারতে চেয়েছিল। কারণটা এতদিন অজানা ছিল। শম্ভু সিং পরিষ্কার করে দিয়েছে। তবু লোকটি দেশকে ভালোবাসে। অনেক প্রমাণ আছে তার। একটা অনুকম্পা জাগে জগতের মনে। ভাবে, সত্য ঘটনা সবাই জেনে গিয়ে ভাল হয়েছে। তবে লোকটির

সম্মান একেবারে ছিনিয়ে না নিলেও চলত। এই সময় তাকে কাজে লাগত।

নীচের থেকে গাড়ী টানার শব্দ ভেসে আসে। এগিয়ে গিয়ে দেখে পাহাড়ী রাস্তা ধরে বলদের গাড়ি করে বড় বড় পাথরের টুকরো বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে ওপরে। চিতোরকে আরো সুরক্ষিত করার আয়োজন।

জগত নীচে নেমে যায়। গাড়ীর চালকদের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে ভাবে, সেও যদি চিতোরের জন্যে এভাবে ঘাম ঝরাবার সুযোগ পেত বড় ভাল হত। মেবারের মানুষ হয়েও এখনো সে যেন অতিথি। এখনো তার সঙ্গে যেন ভদ্রতার পালা চলেছে এবং সেই সঙ্গে ভাবভঙ্গীতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

গাড়ীর চালকদের একজনকে প্রশ্ন করে—দিনে কতবার ওপর নীচ করতে পার?

—দুবার মাত্র। দেখছেন তো রাস্তা। অর্ধেক রাস্তা আমাদের গাড়ী ঠেলতে হয়।

—উপায় নেই। কঠিন হলেও করতে হবে।

—সে তো বটেই। হেই, হট্ হট্।

গোরা ওপর থেকে ঘোড়ায় চড়ে নামছিল। জগত সিংকে দেখে থামে। কাছে এসে বলে—তুমি এখানে কি করছ?

—দেখছি।

—ওদিকে রাণা তোমাকে খুঁজছিলেন। বাদল তোমায় না পেয়ে ফিরে গেল।

জগত সিং লজ্জিত হয়ে ছুটতে থাকে। রাজসভায় প্রবেশ করে রাণা এবং ভীম সিংকে প্রণাম জানিয়ে বলে—মহারাণা আমায় স্মরণ করেছিলেন?

—হ্যাঁ। দিল্লীর সুলতানের কোন খবরই পাচ্ছি না। তুমি যে সংবাদ এনেছ সে ব্যাপারে তুমি কি নিঃসন্দেহ?

এতদিন পরে এই প্রশ্নে হতচকিত হয় জগত সিং। তবু সে সংযতভাবে বলে—হ্যাঁ মহারাণা। আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তিনি আক্রমণ করবেনই। মুখে তিনি যা বলেন, কাজে সব সময় তাই করে থাকেন।

—তুমি কত দিন হল এসেছ? এক মাস হতে চলল না?

—হ্যাঁ মহারাণা। বেশীই হল।

—এখনো কোন খবরই পাচ্ছি না কেন?

—অনেক সময় ভারী ধরনের অভিযানের আয়োজন করতে সুলতানের সময় লাগে। এই জন্যেই আমি চিন্তিত।

—হুঁ।

সভায় আর কেউ কিছু বলে না।

জগত সিং বলে,—মহারাণা।

--বল জগত সিং।

—আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। একটা কথা বলতে পারি?

—নিশ্চয়।

—সুলতানের আক্রমণের ফলাফল কি হবে জানি না। জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা দু-পক্ষেরই সমান সমান।

কয়েকজন তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে।

ভীম সিং হাত তুলে তাদের শান্ত করে।

জগত সিং বলে - আমাদের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিলেই ভাল হবে। সেই হিসাবে আমি একটি সিদ্ধান্তে এসেছি। তবে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। আমি সামান্য রাজপুত।

শম্ভু সিং বলে,—তুমি বল জগত। মহারানা নিশ্চয় শুনবেন।

— দিল্লীর সুলতানের সৈন্য সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। তাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত রসদ থাকে। তাদের পঞ্চাশজন সিপাহী নিহত হলে যে ক্ষতি আমাদের একজনের মৃত্যুতে সেই একই ক্ষতি। আমাদের সম্বল শুধু বীরত্ব, যুদ্ধ কৌশল আর দেশপ্রেম। কিন্তু যুদ্ধ কৌশলে আলাউদ্দিন অতুলনীয়। এই সব চিন্তা করেই আমার মাথায় ধারণাটা এসেছে।

সবাই অপেক্ষা করে।

জগত বলে চলে---এবারে যদি আমরা জয়ীও হই, সুলতান ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি আবার আক্রমণ করবেন। তাই বলছিলাম এখন থেকেই দিল্লী এবং দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরে আমাদের কিছু কিছু লোক থাকা দরকার। তারা সময় মত খবর দেবে।

একজন হেসে বলে --এসব অনেক পরের ব্যাপার।

---না। এখন থেকেই প্রস্তুত থাকা ভাল।

ভীম সিং বলে---তারা সেইসব শহরে কিভাবে থাকবে?

--ব্যবসা করবে। দরকার হলে মহারাণা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করবেন। সেইসব রাজ্যের সৈন্য বাহিনীতেও ঢুকে পড়া যায়। আমি নিজে সুলতানের একজন সিপাহী।

লক্ষ্মণ সিং বলে,— তোমার কথা উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমি ভেবে দেখব।

জগত সিং-এর বড় ইচ্ছা ছিল আফিম আর ভাঙের কথাও উত্থাপন করে।

– লোকে এমনিতেই যে পাগল বলে তোমাকে।

—বলে বলুক। কিছু এসে যায় না। লোকের ঘরে পদ্মিনী নেই। থাকলে উন্মাদ হয়ে যেত। একটু আমার কাছে আসবে লক্ষীটি ?

—দেখে ফেললে কেউ ?

—দেখুক।

—তোমার সম্মানটি যাবে।

—তবে চল ওই গাছের আড়ালে ?

—বাঃ, সারারাত তো পাশেই ছিলে।

—তোমার রূপ এক এক পরিবেশে এক এক রকমের। রাতের পদ্মিনী আর এই ফুলের মধ্যের পদ্মিনীর মধ্যে অনেক তফাৎ। তুমি বুঝবে না। তাছাড়া রাত তো কখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

ভীম সিং পদ্মিনীর হাত ধরতে যায়। সভয়ে পদ্মিনী দূরে সরে গিয়ে চকিতে চারদিকে চেয়ে নেয়। দাসীদের মধ্যে কে যে কোথা থেকে দেখছে কিছুই ঠিক নেই। সে স্বামীকে ইঙ্গিত করে নিজেই ছুটতে ছুটতে চলে যায় অদূরে বৃক্ষকুঞ্জের অন্তরালে

জগত সিং-এর কুটিরের বিভিন্ন কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন থেকে সে নিজের কুটিরেই থাকে। এক সময় তার পূর্বপুরুষেরা এই ভিটেতেই বাস করত। এই জমির ওপর তাদের পদচিহ্ন পড়ত। জগত সিং মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিয়েছিল গৃহপ্রবেশের সময়। এই ভিটেই একদিন আগুন লেগে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল বাবারাম সিং-এর ষড়যন্ত্রে। ভালভাবে লক্ষ্য করলে আশেপাশের পাথরের চাঁইগুলোতে এখনো হয়ত পোড়া দাগ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। বিগত ঘটনাকে বর্তমানের মধ্যে টেনে এনে লাভ নেই। যা পেয়েছে রাণার কাছ থেকে তাতেই সে কৃতার্থ। মনে মনে তার শুধু কামনা, এর প্রতিদান যেন সে দিতে পারে।

সন্ধ্যায় কুটিরে ফিরে নিজের হাতে কয়েকখানি চাপাটি তৈরী করে রেখে দিয়ে জগত সিং সেদিন আকাশপাতাল ভাবছিল। অদূরে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। নিজে রাজপুত হয়েও রাজপুতদের আচার-ব্যবহারে এখনো সে রপ্ত হয়নি। সে লক্ষ্য করেছে, এদের কতকগুলো সখ রয়েছে। যেমন কুকুরের প্রতি এদের অস্বাভাবিক প্রীতি। প্রায় প্রতি গৃহেই বলতে গেলে কুকুর আছে। এর কারণ অবশ্য রয়েছে একটি। বৎসরে একবার শিকারে যাবার প্রথা রয়েছে। সেদিন রাণা থেকে সুরু করে বহু ব্যক্তি যোগদান করে থাকে। এটি একটি উৎসব। এ

শিকারে কুকুর বড় রকমের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয়। কুকুর এদের সংসারে একটি মান্যগণ্য প্রাণী হিসাবে বিরাজ করে। জগত সিং-এর বাসনা সেও একটা কুকুর পুষবে।

তীর ধনুকের ওপর রাজপুতদের যেন সহজাত প্রীতি। মোষের সিং-এর শক্ত ধনুক এদের হাতে হাতে। সঙ্গে থাকে সুদৃশ্য তীর। সেই তীরের গোড়ায় বাহারি পালক। এরা তীর দিয়ে শিকার করে। তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা যেখানে-সেখানে শুরু হয়ে যায়। আর ধনুকের সঙ্গে তীর সংযোজন যদি একবার করা হয়, তাহলে সেটি আর খুলে নেবার নিয়ম নেই। তাতে নাকি অমঙ্গল হয়। তাই কিছু না হোক মাটিতে সেটি নিক্ষেপ করতে হয়। তীরের গোড়ার পালক অবধি সেটি মাটিতে ঢুকে যায়। জগত সিং-এর বড ইচ্ছা সে তীর নিক্ষেপ শিখবে। সে শুধু তলোয়ার আর বল্লমের ব্যবহারই জানে।

জগত দেখেছে, রাজপুতরা কুস্তি লড়তে ওস্তাদ। পথ চলতে চলতে হামেশাই এখানে ওখানে ভীড় জমে থাকতে দেখে। কুস্তি চলে সেখানে। দিল্লীর মানুষের মত অর্থের প্রাচুর্য এদের নেই বটে, কিন্তু জীবনে বৈচিত্র্য রয়েছে যথেষ্ট। জীবনকে এরাই ঠিক উপভোগ করে। দিল্লীর জীবনযাত্রা কেমন যেন মাপা-মাপা। সব সময় একটা অজ্ঞাত ভয় পেছনে পেছনে অনুসরণ করে। কারণ সেখানে সুলতানের হুকুমে গর্দান যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। যার গর্দান যায় সে যে সবক্ষেত্রে অপরাধী এমনও নয়। কিংবা অপরাধ হয়ত খুবই লঘু ধরনের।

জগত সিং প্রদীপের নম্র শিখার দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক কথাই ভাবছিল। ঘুম পেলে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বে। দিল্লীর ইমতিয়াজের মত এখানে তার কোন প্রাণের বন্ধু হয়নি এখনো। একমাত্র বাদলের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু বাদল তার মত সাধারণ পরিবারের মানুষ নয়। সে জগত সিং-এর কুটিরে এসে গল্প করতে পারে না। যেটুকু করেছে তাতেই কৃতজ্ঞ জগত।

আঙিনায় ইমতিয়াজের ঘোড়াটি মাটিতে পা ঠুকছিল। সময় মত দানা-পানি পায়ে সে বেশ সুখেই আছে। মনেও হয় না ইমতিয়াজকে সে কখনো চিনত বলে। অথচ বেচারা একে কত যত্নআত্তিই না করত। কুকুরেরা এমন হয় না। ঘোড়াকে যদি প্রশ্ন করা যায়, তুমি কার? সে উত্তর দেবে,—যখন যার তখন তার। কুকুর কিন্তু তেমন নয়। বাদল তাকে একটা ভাল কুকুর দেবে বলেছে।

বাইরে কে যেন এল। পায়ের শব্দ। লাঠির ঠক্ঠক্ শব্দ করতে করতে কে যেন এগিয়ে আসছে। কাশির আওয়াজ। বয়স্ক লোকের কাশি। কে হতে পারে? পথ চলতি ভিখারী?

জগত সিং অপেক্ষা করে।

—জগত সিং আছো?

সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠস্বর। দুর্বল এবং শ্লেষ্মায় জড়ানো।

—কে?

—ভেতরে যাব?

জগত ভেবে পায় না কে এসেছে। তবে কথার মধ্যে নম্রতা রয়েছে। তার নাম জানে। নাম ধরেই ডাকছে। বয়স্ক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে।

সে বলে—আসুন।

জগত উঠে প্রদীপ হাতে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে যায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাবারাম সিং। একটি কিশোরের কাঁধে তার হাত।

—অবাক হয়েছ? জানি হবে। তবু এলাম। রাতে চোখে দেখতে পাই না ভাল। একে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার নাতি। মেয়ের ছেলে।

জগত সিং বাবারামকে অভ্যর্থনা করে তার শয্যার ওপর নিয়ে বসায়। ছেলেটি ইতস্তত করে।

জগত সিং তাকেও বসতে বললে বাবারাম সিং বলে না না। ও বসবে না। ও বাইরে অপেক্ষা করবে। তুমি একটু বাইরে যাও শক্তি।

সুন্দর নাম কিশোরের। চেহারাও সুন্দর। কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে এসেছে। দাদুর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সে বার হয়ে যায়। যাবার সময় জগত সিং-এর দিকে এক অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টি হেনে যায়। জগত বুঝতে পারে না সেই দৃষ্টির অর্থ।

বাবারাম সিং-এর এই আকস্মিক আবির্ভাবে জগত বিস্মিত হলেও স্বাভাবিক ভাবেই নেয়। সে নিজে থেকে কিছুই বলে না। বৃদ্ধের যা বলার বলুক। সে শুনে যাবে।

বাবারাম স্থির হয়ে বসে একটু দম নেয়। তারপর মাথা উঁচু করে দেখে জগত তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সহসা বৃদ্ধ জগতের হাত দুখানা চেপে ধরে বলে, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।

- ওকথা বলবেন না। আমি এসব ভুলে যেতে চাই। মেবারে কেউ আমার শত্রু নয়। আপনাকেও শত্রু বলে ভাবি না।

—সেটা তোমার উদারতা। কিন্তু আমার বিবেক আছে। এতদিন ছাই চাপা পড়ে ছিল। আমার সম্মান গিয়েছে। লোকে আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চায়। সহ্য করতে না পেরে বাড়ীর ভেতরে আশ্রয় নিয়েছি। আজও এসেছি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে। তোমার ক্ষমা পেলে শান্তিতে মরতে পারব।

—আপনাকে ক্ষমা করার কথা ভাবা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। যে ক্ষমা করবে, তারও যোগ্যতা থাকা দরকার। তবু আপনি যদি সত্যিই শান্তি পান তবে বলছি ক্ষমা করেছি। আসলে আপনার প্রতি কোন বিদ্বেষই আমার নেই।

—সব জেনেশুনেও একথা কি করে বলছ?

—দিল্লীতে মানুষ হয়েছি বলে বোধহয়। ওখানে এসব ব্যাপার অতি সাধারণ। সেখানে নারীত্বের মর্যাদা এমন আকাশ ছোঁয়া নয়। নারীর মনকে বুঝবার প্রয়োজন ও মনে করে না অনেকেই। অবিশ্যি এসব আমার শোনা কথা। কিছুটা দেখেছিও। আপনি আমার মাকে ভালবাসতেন। ভালবাসা অন্যায় নয়। মায়ের অসম্মান আপনি কখনো করেন নি। মায়ের মন জয় করতে পারেন নি বলে একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ আপনার ছিল। তাই মা যাঁকে ভালবাসতেন তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না আপনি। খুবই স্বাভাবিক। গোপনে হত্যা করতে না চেয়ে যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে বাবাকে নিহত করতেন তাহলে আপনাকে বিন্দুমাত্র পাপ স্পর্শ করতে পারত না। তবে রাজসভা থেকে আপনাকে বহিষ্কার করে দেওয়া ঠিক হয় নি। কারণ আমি জানি এই বয়সে আপনার প্রতিশোধস্পৃহা কখনই থাকত না। বাবা বেঁচে থাকলেও না।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বলে,—তুমি বলছ কি জগত। এযে অবিশ্বাস্য।

-হয়ত তাই। আমার মধ্যে ভাবাবেগের বড্ড অভাব। এই অভাবের জন্যেই আমি কোনদিন সম্পূর্ণ রাজপুত হব না বোধহয়।

বৃদ্ধ বহুক্ষণ নিশ্চল বসে থাকে। তারপর বলে,- এই অভাবই মানুষকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করে কিনা কে বলতে পারে? এই অভাব যদি আমার থাকত তাহলে তোমার মায়ের ব্যাপার যুক্তির সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে পারতাম। পাগলের মত তোমার বাবাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ফিকির খুঁজতাম না। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি জগত। আমার পুত্র নেই। যতদিন বেঁচে আছি তোমাকে আমার স্নেহভাজন বলেই জানব।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ায়। জগত তার হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে। বৃদ্ধ একটু দ্বিধাভরে বলে,—আমার বাড়ীতে একদিন যাবে জগত?

—যেতে পারি।

—যেও। এমনি সময়ে একদিন যেও। দিনের বেলায় যেতে বলি না তোমাকে।

অন্ধকারের ভেতর থেকে বাবারাম সিং-এর দৌহিত্র এগিয়ে আসে। তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু তার হাবভাবে বোঝা যায় জগতকে সে পছন্দ করছে না।

সে দাত্তুর হাত ধরে বাইরে চলে যায়।

চিতোরের নীচে সমতলে অনেক নেতা ও সর্দার তাদের দলবল নিয়ে জড়ো হতে শুরু করেছে। সর্দারেরা প্রতিদিন রাজসভায় এসে হাজিরা দেয়। তাদের লোকজনেরাও চিতোরের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে নগরীর শোভা দেখে। দেব দেবীর মন্দির দর্শন করে প্রণাম জানায়। তারা এসেছে মহারাণার আহ্বানে। আলাউদ্দিনের মতলবের কথা তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে দূতেরা। আরও অনেকে আসছে।

রাণা লক্ষ্মণ সিং রাজসভায় সর্দারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেও প্রায় প্রতিদিনই তাদের লোকজনদের সুখ সুবিধার তদারকি করার জন্যে নীচে নামে। যোগাযোগ রাখে সবার সঙ্গে। সে যেদিন নিজে না যেতে পারে ভীম সিং কিংবা অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা গিয়ে ঘুরে আসে।

গোরা এবং বাদল দুটি ঘোড়ায় চেপে চিতোর দুর্গ ছেড়ে সেদিন সমতলে আসছিল। রাণা আসতে পারেনি। ওরা দেখতে পায় একজন ঘোড়সওয়ার তাদের অনেক আগে বেশ জোর কদমে ছুটে চলেছে। ধুলোর পর্দা তাকে কিছুটা ঢেকে ফেললেও বাদলের চিনতে অসুবিধা হয় না।

হেসে বলে—জগত সিং।

গোরার কপালে রেখা ফুটে ওঠে। বলে—ও কোথায় চলেছে বলতে পারো?

—না। রোজই অনেকটা দূরে চলে যায়। ঘোড়াকে সচল রাখে। দারুণ ঘোড়া। কাছ থেকে দেখেছেন?

—হুঁ। চমৎকার। দিল্লীর সব ঘোড়াই অমন নাকি?

—ঈশ্বর জানেন। ওটা নাকি চুরি করা ঘোড়া। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর।

কিছুটা এগিয়ে গোরা বলে—ওর বাড়ীতে একদিন রাতে বাবারাম সিং গিয়েছিলেন। খবর রাখো?

—শুনেছি।

জগত সিং নিজে বলেছে তোমায়?

—না। দরকার হলে বলত।

—বাবারাম মান-অপমান জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছে দেখছি।

—এতদিন তো খুব ছিল। রাণা অবধি যথেষ্ট সম্ভ্রম দেখাতেন।

—আসল পরিচয় জানা ছিল না তখন।

—সেটা জানার পরই হয়ত সম্ভ্রম-বোধ হারিয়েছে।

গোরা সহসা অশ্বের রাশ টেনে ধরে। বাদলও থেমে যায়। সে গোরার মধ্যে অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করে।

গোরা বলে—আলাউদ্দিনের কোন খবর নেই।

বাদল বুঝতে পারে না, গোরা কেন একথা বলল। সে বলে,—বড় রকমের আক্রমণ আশঙ্কা করছে জগত। বিরাট বাহিনী আসবে। তাই আয়োজন করতে হচ্ছে প্রচুর। খাদ্য সম্ভারও বয়ে আনতে হবে।

গোরা হঠাৎ বলে ওঠে—জগত সিং কি বিশ্বাসী? তার ওপর একটু বেশী নির্ভর করা হচ্ছে না কি?

বাদল স্তম্ভিত হয়। সে বলে—এ কথা বললেন কেন?

—সে যে বিশ্বাসী তার প্রমাণ কোথায়?

এবারে বাদল গোরার মনের হদিশ পায়। বলে—প্রথমদিনেই রাজসভায় যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে। আপনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন না।

—আমি শুনেছি। কিন্তু একজন উঁচু দরের গুপ্তচরের পক্ষে এ ধরনের প্রমাণ সংগ্রহ করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। বিশ্বাসী হবার জন্যে এইটুকু প্রমাণ অত্যন্ত জরুরী।

—কী বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। জগত সিং-এর ওপর আমি মোটামুটি নজর রেখেছি। প্রতিদিনই ও চিতোর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যায়। ওকে অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওর ঘোড়াটি অসাধারণ। এত ভাল একটি ঘোড়া সাধারণ লোকের থাকে না। তাই ও বলে বেড়ায়, বন্ধুর ঘোড়া চুরি করেছে। বাবারাম ওর বাড়ীতে গেলে, বাইরে ওর নাতি পাহারা দিচ্ছিল। ওর নাতি শক্তি সিং আরও একদিন জগতের সঙ্গে দেখা করেছে রাতে। এ সবের অর্থ কি দাঁড়ায়?

বাদল আর চুপ করে থাকতে পারে না। সে বলে কাকা, আপনি মিথ্যা সন্দেহের পেছনে ঘুরছেন। জগত সিংকে আমি চিনে ফেলেছি। সে প্রকৃত দেশভক্ত। চিতোরে তার জানা শোনা বিশেষ কেউ নেই, তাই হয়ত দূরে চলে যায়। ওর মন আর মুখে কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া বাবারাম সিংকে হঠাৎ অতটা হীন ভাবছেন কি করে?

-উচ্ছ্বাসের বসে জ্ঞান হারিও না বাদল। সব কিছু সোজা চোখে দেখার চেষ্টা করবে। নইলে বিপদ ঘটবে।

ভেতরে ভেতরে অসন্তুষ্ট হয়ে বাদল বলে- বেশ তো আজই প্রমাণ হয়ে যাক। চলুন জগতকে অনুসরণ করি।

- ওকে পাবে না। ও গিয়েছে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে। রাতে ফিরবে।

· আমরাও না হয় তাই ফিরব। তাছাড়া দিল্লীর সুলতানের আক্রমণের কথা কোন্ গুপ্তচর আগে ভাগে জানিয়ে দেয় ?

এ ও এক ধরনের কৌশল হতে পারে।

— কোন্ ধরনের ?

আমাদের সর্দারেরা এখানে অলসভাবে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠবে। ঘরের কাজ, চাষের কাজ পড়ে থাকায় অসন্তোষ দানা বাঁধবে তাদের মনে। শেষে মহারাণা বাধ্য হয়ে তাদের একদিন বিদায় দেবেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চিতোর আক্রান্ত হবে। তখন ওদের আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে ?

গোরার যুক্তিতে কোন ফাঁক নেই। কিন্তু বাদল কিছুতেই মানতে পারে না। আজই একটা ফয়সালা করে ফেলার জন্যে সে মনস্থির করে।

দূরে নিকটে অনেক পর্বত শ্রেণী। উপজাতীয় যারা সমবেত হয়েছে, তাদের কোন শিবির নেই। শিবির ব্যবহারের মত তারা উন্নত নয়। বড় বড় গাছের নীচে তাদের আস্তানা, সেইখানেই রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া আর শোয়া বসা। তবে কিছু কিছু ছাওনি করে নিয়েছে অনেকে।

গোরা ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে দেখা করে। বাদলও সঙ্গে থাকে। তার মন অস্থির। জগতকে আজ চিতোরের বাইরে ধরতেই হবে। ওকে এখন দেখা যাচ্ছে না। সামনের ওই পিঠ-কুঁজো পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে। কিংবা মোড় ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে কোথাও গিয়েছে।

গোরা সব কিছু দেখেশুনে ফিরতে চায়। কিন্তু বাদল তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়। তার ধারণা জগত সিং সোজা পথেই গিয়েছে। সেকথা সে গোরাকে জানিয়ে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোরা তার সঙ্গ নেয়।

মেবারের পার্বত্য উপত্যকা আর সমতল ভূমিতে এখন রবিশস্যের সমারোহ। কিছুদিনের মধ্যে এই শস্য কৃষকদের ঘরে উঠবে। আলাউদ্দিন যদি তার আগেই এসে পড়ে তাহলে সে-ই হবে এই শস্যের মালিক। কারণ মেবারবাসী জানে, দিল্লীর সুলতানকে মাঝপথে বাধা দিয়ে প্রচণ্ড সংগ্রাম করার মত সামর্থ তাদের নেই। পথের মধ্যে বড় জোর তাদের উপর ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চালানো যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত বড় যুদ্ধ হবে চিতোরকে ঘিরে। সমস্ত শক্তিকে সংহত করে চিতোরকে রক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। চিতোর রক্ষা পেলেই

মেবার রক্ষা পাবে। তাই অতি সুরক্ষিত এই নগরী। এতে ওঠার নানান পথ আছে। সুদূর অতীতে কোন বাঁধাধরা পথ দিয়ে শত্রুরা এর ওপর আক্রমণ চালায় নি। যখন যেমন সুবিধা পেয়েছে তেমনি ভাবে আক্রমণ চালিয়েছে।

ওরা এগিয়ে চলেছে।

গোরা বলে এতক্ষণে জগত সিং অন্যপথে চিতোরে ঢুকে ভালমানুষ সেজে বসে রয়েছে।

বাদল সে কথার জবাব দেয় না। মনে মনে সে শুধু প্রার্থনা করে জগতের সঙ্গে এইখানেই যেন তাদের দেখা হয়ে যায়।

তার আশা অনতিবিলম্বেই পূর্ণ হয়। দূর থেকে একটি ঘোড়া ছুটে আসতে দেখা যায়। বাদল গোরার দিকে দৃষ্টিপাত করে। গোরার চোখে কৌতূহল। ঘোড়-সওয়াকে চেনা না গেলেও জানতে অসুবিধা হয় না যে জগত ছাড়া কেউ নয়।

কাছে এলে ওদের দুজনকে দেখে জগতের পরিশ্রান্ত মুখে হাসি ফোটে। বলে আপনারা? ভালই হল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বাদল প্রশ্ন করে, কোথায় গিয়েছিলে জগত সিং?

— সামনে। ওই পাহাড়ের ওদিকে। আচ্ছা বসন্তোৎসব কবে হবে?

বাদল বলে, এই তো কিছুদিন পরেই। কেন?

জগত পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে - ওরা সব আসছে।

গোরা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে – কারা?

— পাহাড় থেকে। ওদের বড় দল পেছনে আছে। পাঁচজন ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে এসেছে। বলল যে, কাল দুপুর নাগাদ তাদের দল পৌঁছে যাবে।

বাদল বলে তুমি রোজই এদিকে আসো নাকি?

- না। রোজ নয়। প্রায়ই। খুব ভাল লাগে।

জগতের মুখে তৃপ্তির হাসি। তার কণ্ঠে সরলতা। বাদল ভাবে এই মানুষটাকে .র কাকা সন্দেহ করে।

সে নিম্নস্বরে গোরাকে বলে,—এখনো অবিশ্বাস হয়?

— নিশ্চয়। ওসব হাসিতে ভুলি না।

জগত সিং বলে,—আপনারা এদিকে কেন এসেছিলেন?

গোরা বলে, এমনিতে।

—কালকে কোনদিকে যাব তাই ভাবছি।

গোরা বলে—গতকাল কোনদিকে গিয়েছিলে?

– দক্ষিণদিক দেখে এলাম। আমার একটা সন্দেহ হয়। আপনারা নিশ্চয় জানেন। আমার বিশ্বাস দিল্লীর সুলতান দক্ষিণদিক দিয়ে আক্রমণ চালাবেন।

—কেন ?

—ওদিক দিয়ে চিতোরকে আঘাত হানতে অনেক সুবিধা। আমি ওদিকটা ভালভাবে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। চিতোরে ওঠার রাস্তা ততটা দুর্গম নয়। পরিখা খনন করা অনেক সহজ।

বাদল অবাক হয়। জগত সিং সত্যি কথাই বলেছে। সে আড়চোখে গোরার মুখের দিকে চায়। ভাবে, এবারে বরফ গলতে শুরু করবে হয়ত। কিন্তু সেই মুখ তখনো পাষাণের মত নিরেট।

গোরা বলে—বাবারাম সিং-এর সঙ্গে তোমার দেখা হয় ? তোমার জন্যেই বলতে গেলে লোকটার পতন হল।

জগতের মুখে বেদনার আভাষ। সে বলে—দেখা হয়েছে। ওঁর জন্যে কষ্ট হয়। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে।

—কেন ? রাতে কেন ?

জগত অনেক দ্বিধাভরে ধীরে ধীরে বলে—সঙ্কোচে। দিনেরবেলা লোকে দেখে ফেলবে ভয়ে। লোকে নাকি ওঁর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চায়। অথচ ওঁর ওপর আমার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই।

এবারে বাদল জ্বলে ওঠে, বিদ্বেষ নেই ? এতবড় অপরাধ করা সত্ত্বেও বিদ্বেষ নেই ? ও তো হত্যাকারী। এতদিন ও জানত, তুমি আর তোমার বাবা পুড়ে মরেছ।

—হ্যাঁ। তাই জানতেন বটে। অপরাধী উনি নিশ্চয়। কিন্তু সমস্ত কিছু করেছেন আমার মাকে ভালবেসে। ব্যর্থতা ওঁকে পাগল করেছিল। ওঁকে কি রাজদরবারে ঠাঁই দেওয়া যায় না ?

গোরার সন্দেহ এক ফুৎকারে কখন উড়ে গিয়েছিল। বাদলও টের পায়নি। সে চেঁচিয়ে বলে—তুমি আস্ত উন্মাদ।

জগত চুপ করে যায়। তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে বলে ওঁকে দরবারে নিলে আমার মন হালকা হত।

গোরা রেগে ওঠে –কি বললে ? মন হাল্‌কা হত ?

জগত থতমত খেয়ে যায়। সে বুঝতে পারেনি, মনের বাসনা মুখ ফুটে বার হয়েছে তার অজ্ঞাতে।

গোরা ধমকে বলে—তাহলে তোমাকে বিদায় নিতে হবে। বল, রাজী আছ ?

জগত বেশ খানিকটা সময় চুপ করে থেকে বলে— আমার জীবন সবে শুরু। দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে এসে মোটামুটি সামলে নিচ্ছিলাম। এখন যদি এখান থেকে চলে যেতে হয়, তাহলে আমার বুক ভেঙে যাবে। মাতৃভূমির স্বাদ সবে পেয়েছিলাম। তবু বিদেশে গিয়ে আবার গুছিয়ে নেবার বয়স রয়েছে আমার। কিন্তু বাবারামের সেই বয়স নেই। তাই আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী।

গোরা ছেলেমানুষের মত কাজ করে বসে। সে ঘোড়া ছুটিয়ে জগতের পাশে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বলে—তোমার ইচ্ছা পূরণ হবার নয় জগত। আমি এমনিতে বলেছিলাম। মহারাণা আর ভীম সিং কিছুতেই রাজী হবেন না। এতে লোকের কাছে তাঁরা ছোট হয়ে যাবেন। তুমি ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।

বসন্ত উৎসবের সমারোহ সারা মেবারে। আর চিতোর হল তার প্রাণকেন্দ্র। বাসন্তীদেবীর আরাধনা আর পূজাদান এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। পর্বতবাসী, অরণ্যবাসী সবাই এসে ভীড় করে মেবারের রাজধানীতে। পদমর্যাদার ভেদাভেদ উঠে যায় সাময়িকভাবে। সবাই সমান। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও এই কদিন আলগা কথা বলে বেড়ায়। সিদ্ধি, ভাঙ, আফিম ইত্যাদি নানারকমের নেশায় বুঁদ হয়ে লোকে আনন্দ করে। কোন বাধানিষেধ নেই।

জগত সিংও এই প্রবল আনন্দস্রোতে ভেসে যায়। কিন্তু নেশা করে না সে। করতে পারে না, অভ্যাস নেই বলে। সে ভাবে, যদি সে আলাউদ্দিন হত তাহলে ঠিক এই সময়টিকে মেবার আক্রমণের জন্যে বেছে নিত। রাজপুতদের নিশ্চিত পরাজয়। ভরসার কথা আলাউদ্দিনের আগমন সংবাদ এখনো এসে পৌঁছোয় নি। তবে সম্ভাবনার কথা এখনো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক মাস সময়টা যথেষ্ট দীর্ঘ। বাদলকে বলেছিল, আনন্দ স্ফূর্তি এবারে কিছুটা কম করা যায় কিনা। শুনে বাদল ভীত হয়ে পড়েছিল।

তার ভয় অহেতুক নয়। কারণ এই বাঁধভাঙ্গা আনন্দোচ্ছ্বাসকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়বে দেশে। ফল হবে আরও মারাত্মক। রাণা জেনেশুনেও তাই চুপ করে আছেন। জগত বুঝতে পারে ব্যাপারটা।

বসন্ত পঞ্চমীর দুদিন পরে ভানু-সপ্তমী। সবকিছুই নতুন জগত সিং এর কাছে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বার হয়ে নগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকেন স্বয়ং রাণা। গণ্যমাণ্য কেউ বাদ যায় না। বাদলের সঙ্গে

জগতও যোগ দেয় তাতে। ভুলে যায় আলাউদ্দিনের কথা। বুক তার ভরে ওঠে কানায় কানায়। ভাবাবেগকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। তবু নানা কথা ভাবতে ভাবতে তার বুকের ভেতরে এমন একটা কিছু অনুভব করে যা আগে করেনি।

শোভাযাত্রা শেষ হয় সূর্য মন্দিরের দ্বারদেশে। প্রসাদ গ্রহণ করে প্রতিটি মানুষ। কণিকামাত্র প্রসাদ প্রতিজনের ভাগে। তবু কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা। জলজ্বলে মুখে ঝলমলে পোষাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় হাত ঠেকিয়ে সবাই সেই প্রসাদ মুখে ফেলে দেয়। –

সূর্যই হলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। সূর্যদেবেরই উত্তর পুরুষ মেবারের রাণা বংশ। তাই ভানু-সপ্তমীর এই আড়ম্বর। ভানু অর্থাৎ সূর্যদেবের পরিতোষের জন্য প্রতিটি রাজপুত তার দেহের শেষ রক্তবিন্দু যুদ্ধক্ষেত্রে ঢেলে দেবার জন্যে উন্মুখ। ফলে যুদ্ধচিন্তা তাদের বিমর্ষ করে না। দিল্লীর সুলতানের আক্রমণের আশঙ্কায় রাণার দুশ্চিন্তা হতে পারে। কারণ দেশের দায়িত্ব তাঁর ওপর। কিন্তু সাধারণ রাজপুত এর জন্য উতলা নয়। যুদ্ধ তাদের অভিপ্রেত। যুদ্ধই একমাত্র পথ যা তাদের আত্মাকে পৌঁছে দেবে স্বর্গের উচ্চতম অমৃতলোক অর্থাৎ ভানুলোকে।

সারাদিনের অনাবিল আনন্দের পর শ্রান্ত দেহ নিয়ে জগত সিং ঘরে ফেরে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অনেকে তখনো উৎসব চালিয়ে যাচ্ছে। পর্বতবাসীরা নেশার ঘোরে নাচগান শুরু করেছে। নগরীর পথঘাট আজ দেওয়ালীর রাতের মত আলোকোদ্ভাসিত। খাবার আয়োজন করতে ইচ্ছা হয় না জগতের। সারা-দিনের ঘটনার স্মৃতি তার মনের মধ্যে বিচিত্র চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি করে। সে তন্ময় হয়ে বসে থাকে।

সেই সময়ে শক্তি সিং এসে প্রবেশ করে। অত্যন্ত নির্বিকার কণ্ঠে বলে,— দাদু একবার ডেকেছিলেন। যেতে পারবেন?

—যাব। কাল।

—এখুনি ডাকছিলেন।

উৎকণ্ঠিত জগত প্রশ্ন করে, –শরীর ভাল আছে তো তাঁর?

—হ্যাঁ।

অন্য কোন কারণ থাকতে পারে। নইলে ডাকলেন কেন? জরুরী কিছু হয়ত। বলে—বাড়ী চিনি না। তুমি সঙ্গে থাকবে তো?

– হ্যাঁ চলুন।

ওরা দুজনা আলোকিত রাস্তা দিয়ে চলে। জগত জানে, শক্তি তাকে পছন্দ করে না। তবু দু একটি কথা বলার চেষ্টা করে। শক্তি কোনরকমে কাটা কাটা

জবাব দেয়। তারপর তাকে এড়াবার জন্যে পাশাপাশি না হেঁটে একটু এগিয়ে যায়। জগত তাকে অনুসরণ করে।

বাবারাম নিজেই এগিয়ে এসে তাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানায়। হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। বাড়ীটা বেশ সুন্দর। বসার ঘরখানিও সাজানো-গোছানো। দেখলে যে কেউ বলে দিতে পারে, সাধারণ মানুষের বাসগৃহ এটি নয়।

বাবারাম বলে --তুমি তো নিজে থেকে এলে না। তাই ডাকলাম। তোমাকে কষ্ট দিলাম।

কষ্ট কিছু না। তবে আমি আসতাম।

— কবে আর আসতে। এই বয়সে একটি দিনও কি কম মূল্যের? জীবন এ সময়ে কত অনিশ্চিত। তার ওপর অপমানের বোঝা নিয়ে বাঁচা তো দুরূহ ব্যাপার!

জগত কোন জবাব দেয় না। সে বাবারামের উদ্দেশ্য জানে না। ক্ষমা করার পাট চুকে গিয়েছে। এবার কি তবে বাড়ীতে ডেকে ভাল মন্দ খাওয়ানোর ব্যবস্থা?

বাবারাম বলে—তোমাকে আমি ডেকে এনেছি বিশেষ কারণে। আমার একটি অনুরোধ তোমার কাছে। ঠিক অনুরোধ নয়। বলতে পার প্রার্থনা। হ্যাঁ প্রার্থনাই। অনুগ্রহ করে সেই প্রার্থনা পূরণ কর।

জগত সিং বিচলিত বোধ করে। কী এমন প্রার্থনা যার জন্য এত ভূমিকা এবং এই বয়স্ক ব্যক্তির এ ধরনের কাকুতি-মিনতি?

—কথা দাও জগত সিং। আমি বিবেকের দংশনে ভুগে মরছি। এতে যে কী জ্বালা তুমি বুঝতে পারবে না। আমার অর্থ আছে। ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। সেই ক্ষমতার দম্ভ বিবেককে চেপে রেখেছিল। তুমি এসে ক্ষমতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে। ফলে বিবেক আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই বিবেককে শান্ত করতেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা। কথা দাও।

জগত ধীর কণ্ঠে বলে - আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করার সাধ্য আমার আদৌ আছে কি? আমি অ'ত সাধারণ মানুষ। এখানে সবাই আমার অপরিচিত। আত্মীয় পরিজন বলতে কাউকে খুঁজে পাই নি এপর্যন্ত। তাই বুঝতে পারছি না কথা দিয়ে সেই কথা রাখার সাধ্য আমার আছে কিনা। সেদিন আমার বাড়ী গিয়ে আপনি শান্তি পাওয়ার জন্য আমার ক্ষমা চেয়েছিলেন। সেই যোগ্যতা আমার না থাকলেও বলতে হল ক্ষমা করেছি। আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির ওপর এতটা চাপ দিলে সইতে পারব?

বাবারাম ব্যগ্রভাবে বলে ওঠে – পারবে। অবশ্যই পারবে। তাছাড়া তুমি সাধারণ রাজপুত মোটেই নও। আমি তোমাকে তোমার বংশ পরিচয় বলে দেব। তোমার মাতুলালয়ের সব খবর বলব।

জগতের চোখ দুটো উজ্জল হয়ে ওঠে। সে বলে—তাঁদের কেউ জীবিত আছেন?

বৃদ্ধ দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে – না। কেউ নেই। তোমার মায়ের একটি মাত্র ভাই ছিল। সে মারা গিয়েছে গত বছর। কিন্তু তাদের বংশ পরিচয় আছে। তাই যথেষ্ট।

জগত তার মাতৃ বংশের পরিচয় পাওয়ার ব্যগ্রতায় বলে ফেলে—বেশ। আমি কথা দিলাম।

বৃদ্ধ শক্তির নাম ধরে ডাকে। সে বার হয়ে আসে পাশের কক্ষ থেকে। মুখে তার সেই নির্বিকারত্ব।

—তোর মাকে ডাক।

জগত সিং অস্বস্তি অনুভব করে। শক্তির মা হল বৃদ্ধের কন্যা।

একটু পরেই এক রাজপুত মহিলা প্রবেশ করে। ঘরের স্বল্প আলোয় তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কারণ সে এসে দাঁড়ায় এক কোণে।

বাবারাম বলে– এগিয়ে এসো। তোমার সামনেই কথাটা বলতে চাই।

মহিলা এবারে এগিয়ে আসে। বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সুন্দর স্বাস্থ্য। রূপও ছিল।

মহিলা বলে – তুমি কিন্তু নিজের জেদের বশে সব কিছু করছ। আমি দায়ী থাকব না। তুমি রাজসভায় অপদস্ত হওয়ায় ওরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। লোকে ওদেরও ইঙ্গিত করতে ছাড়ে না। শক্তির মনোভাব তুমি ভালভাবেই জান বাবা।

– আরে, ওরা দুজনেই তো ছেলেমানুষ। এই জগত চমৎকার ছেলে। এর দোষ কোথায়? দোষ তো সবই আমার।

বাবারামের কন্যা বলে– ওরা অতশত বোঝে না। ওরা শুধু জানে, এই জগত সিং-এর জন্যে তোমার সঙ্গে ওদের মাথাও মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তবু তোমার কোন কিছুতে প্রতিবাদ করে না ওরা। তোমায় শ্রদ্ধা করে বলে।

বাবারাম বলে— একবার চেয়ে দেখোতো এর দিকে? কী মনে হয়?

— আমার মনে হবার গুরুত্ব কতটুকু?

– তবু তুমি ওদের মা।

—হ্যাঁ। তাই ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু তুমি তা হতে দিচ্ছ না বাবা।

জগত দেখে তাকে ঘিরে এই পরিবারে অসন্তোষ দানা বেধে উঠেছে। বাবারামের কোন প্রার্থনা থাকলে তার বাড়ীতে গিয়েও বলতে পারত। বাড়ীতে ডেকে এনে কলহ সৃষ্টির কোন অর্থই হয় না।

সে বলে—আমি জানি শক্তি আমাকে দেখতে পারে না। এতে তার দোষ নেই। আমি চাইনা অতীতের কোন ঘটনা আমার জীবনের ওপর ছায়াপাত করুক। আমি নিজে মুক্ত। আমার কোন পাপ নেই। অন্যে কবে কি করেছে, তার জন্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত বা বিতৃষ্ণ হলে সেটা পুরোপুরি তার দায়িত্ব। আমার কিছু এসে যায় না। আমি উঠি।

—না না জগত। তুমি যেও না। আমি একটা সুযোগ পেতে চাই। ওরা ভুল বুঝেছে। অপরিণত মন ওদের। ভবিষ্যতের কতটুকু বুঝতে পারে? আমার চেয়ে বড় হিতাকাঙ্খী ওদের কে আছে? আমি যা ভেবেছি তাই করব।

মহিলা কঠিন স্বরে বলে—তুমি যা ভেবেছ তাতে বাধা পারেনা জানি। কিন্তু একজনের মনের ওপর আঘাত হেনে সেই মনকে সারা জীবন পঙ্গু করে দিয়ে তোমার কী লাভ হবে বাবা?

—ভুল। সম্পূর্ণ ভুল। পঙ্গু হবে না। হতে পারে না। ডাকো ওদের। আর দেরি নয়।

মহিলা অনিচ্ছাসত্বেও ইঙ্গিত করে। শক্তি এসে দাঁড়ায়। আর আসে এক তরুণী।

বাবারাম উঠে তরুণীর হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলে—এই আমার নাত্‌নী লীলাবাঈ। আমার প্রার্থনা তুমি একে গ্রহণ কর।

অসম্ভব এই প্রস্তাবের কথা জগত সিং স্বপ্নেও ভাবেনি। সে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

বাবারাম কম্পিত কণ্ঠে বলে—চুপ করে রয়েছ কেন? তুমি কথা দিয়েছ।

একটু পরে কঠোর কণ্ঠে জগত বলে—আপনার প্রার্থনা এমন হবে জানলে আমি কথা দিতাম না। আমি মস্ত ভুল করে ফেলেছি।

—না। কোন ভুল করনি। তুমি ঠিক কাজ করেছ।

—কিন্তু এদের মন আমার প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। কেন আপনি এই মনকে শুকিয়ে যেতে দেবেন?

মহিলা বলে—ঠিক বলেছ। সুন্দর ছেলে।

জগত একবার চকিতে লীলাবাঈএর দিকে চায়। দৃষ্টি বিনিময় হতেই লীলাবাঈ-এর চোখে আগুন জলে ওঠে।

জগত বলে—আমি অক্ষম। আপনার পরিবারের মঙ্গলের জন্যেই আমাকে কথাটি প্রত্যাহার করে নিতে হচ্ছে।

বাবারাম উন্মাদের মত বলে ওঠে—না। কখনই নয়। এরা দুগ্ধপোষ্য শিশু। কতটুকু দেখেছে সংসারের? কতটুকু জানে?

জগত বলে—কিন্তু যে-জিনিস জানার প্রয়োজন, সেটি এই বয়সেই লোকে জানে সব চেয়ে বেশী। নিজের কথা ভুলে যাবেন না। কোন্ বয়সে আপনি আমার মায়ের প্রত্যাখানের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সেই বয়স আজও আপনার থাকলে আমাকে সাদরে ডেকে আনতে পারতেন?

বাবারাম লীলাবাঈকে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে—তুই আমার সব কিছু ব্যর্থ হতে দিস না। তুই রাজী হ। দেখিস তোর ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকবে। কেন থাকবে না? তুই যে আমাকে শান্তি দিবি—অপার শান্তি।

জগত দেখতে পায় লীলাবাঈএর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা পাষাণের মত কঠোর হয়ে ওঠে। তার চোখ জগতকে ভস্ম করে দিতে চায়। তবু সে ধীর স্থির কণ্ঠে বলে—তোমার শান্তির জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি দাদু। আমি রাজী।

বৃদ্ধ কেঁদে ওঠে। শক্তির ঋজু দেহ শক্ত হয়। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিজের বোনের দিকে চেয়ে থাকে। তার মা নির্বাক।

জগত অসহায়ের মত মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

আবীরে রাঙা হয়ে গোরা চুপি চুপি নিজের কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। বাইরে হৈ হুল্লোড় চলছে। মহা আনন্দে মেতেছে সবাই। অন্দরেও সেই আনন্দ আর রঙের ছোঁয়া লেগেছে। কক্ষের দিকে যেতে যেতে গোরা লক্ষ্য করে মেঝেতে অনেক আবীরের ছড়াছড়ি। কার সঙ্গে এত খেলল কলাবতী?

ঘরে ঢোকার আগেই পেছন থেকে কে যেন তাকে জাপটে ধরে মুখে মাথায় আবীর মাখিয়ে দেয়। সে জানে এই প্রতিপক্ষের কাছে গায়ের জোর খাটে না। এখানে পরাজিত না হয়ে কোন উপায় নেই।

—কি মশায়? আমার কথা মনেই ছিল না। এবারে কেমন হল? জব্দ তো?

গোরা অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে বলে,—আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে অন্ধ করে দিলে ?

—না তো। আমি তোমার চোখে দিইনি। একটু যদি পড়েই থাকে চোখে ক্ষতি কি! ঠিক হয়ে যাবে।

—আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। কোন সন্দেহ নেই। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই দেখ, তাকিয়ে আছি তবু দেখতে পাচ্ছি না।

কলাবতী ত্রাস্ত পদে সামনে এসে বলে—এই তো আমি। দেখতে পাচ্ছো না ?

—না তো। কোথায় তুমি ?

কলাবতী গোরার হাত দুটো তুলে নিয়ে নিজের মুখের ওপর রেখে বলে,—এই তো। দেখতে পাচ্ছো না ?

—না তো ? আমি অন্ধ হয়ে গেলাম শেষে ? সবাই আমাকে কৃপা করবে। তুমিও—

কলাবতী কেঁদে উঠে বলে,—না না। তুমি অন্ধ হওনি।

—তুমি বলছ ? কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

কলাবতী ছুটে গিয়ে একটি পাত্র নিয়ে জলের ঝাপটা দিয়ে গোরার চোখ পরিষ্কার করে দেয়। তারপর বলে—এবারে দেখতে পাচ্ছো ?

—না তো ?

—তাহলে কি হবে ? আমি কি করব ? এই আবীর যে সবাইকেই দিয়েছি। এখনো দেখতে পাচ্ছো না ?

—না।

—আমি তাহলে যাচ্ছি।

—কোথায় ?

—বৈদ্যকে খবর দিতে।

—দাঁড়াও। অত উতলা হয়ো না। একটা কথা মনে পড়ে গেল। একজন সন্ন্যাসী বলেছিলেন কথাটা। কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করবে ?

—হাঁ করব। কি বলেছিলেন তিনি ?

গোরা ঢোক গিলে বলে—তিনি বলেছিলেন হঠাৎ কারও কোন কিছু হলে তার স্ত্রী যদি তাকে খুব আদর করে তাহলে ভাল হয়ে যায়। বোধহয় মিথ্যে কথা। বোধহয় ঠাট্টা করেছিলেন।

—না না, তুমি এসো।

কলাবতী স্বামীর হাত ধরে শয়নকক্ষের দিকে নিয়ে যায়। গোরা অন্ধের মত তার পেছনে পেছনে চলে।

কলাবতী গোরাকে বিছানার ওপর বসায়। তারপর তার মাথা অতি সযত্নে দুহাতে কাছে টেনে এনে চুমু খেতে থাকে আর বলে,—তোমাকে আমি কত ভালবাসি। কি করে বলে বোঝাবো? একি বোঝানো যায়? তুমিই বল। তুমি আমাকে স্পর্শ করলে মনে হয় স্বর্গ সুখ পেলাম। তুমি আমাকে আদর করলে মনে হয়, স্বর্গেও কি এত সুখ আছে? তুমি আমার। আমি একান্তই তোমার। তুমি ভাল হয়ে যাও। তুমি ভাল না হলে যে আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি আমাকে দেখতে না পেলে যে সেই লজ্জা আমি পাবো না। সেই—সেই লজ্জা যখন তুমি আমাকে তোমার দিকে চাইতে বল—

—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

কলাবতী ভীত স্বরে বলে,—কি হল? কষ্ট হচ্ছে?

—না। একটু আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি যেন? দেখি—হ্যাঁ তোমার মুখ খুব অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটু আবীর দাও তো।

কলাবতী আশান্বিত হয়ে অনেকখানি আবীর দেয় গোরার হাতে। সেই আবীর দুই হাতে কলাবতীর মুখে মাখিয়ে দিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরে গোরা বলে—এইবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ব্যস্ একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

কলাবতী তার কবল থেকে মুক্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করে আর বলে,—তোমার সঙ্গে আর কখনো কথা বলব না। যাও—

—তাই বৈকি। তুমি কথা না বললে চারিদিকে যখন অন্ধকার দেখব, তখন?

—জানি না। যাও। তুমি এতক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়েছিলে, সব দেখছিলে। আমার ভীষণ লজ্জা করছে। কী লজ্জা!

কলাবতী গোরার বুকে মুখ গোঁজে।

সেই সময় কক্ষের বাইরে বাদলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কলাবতী ছিটকে দূরে সরে যায়।

বসন্তোৎসবের শেষ পর্ব মিটতে না মিটতেই সেই অতি-প্রত্যাশিত দুঃসংবাদ এসে পৌঁছোয় চিতোরে। দিল্লীর সুলতান মেবার সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে।

রাজধানীর কর্মতৎপরতা ভীষণ ভাবে বেড়ে ওঠে। অহরহ ব্যস্ত অশ্বারোহীদের আনাগোনা দেখতে পায় চিতোরবাসীরা। পূর্ব-নির্ধারিত কৌশল অনুযায়ী সৈন্যদলের প্রায় অর্ধেক কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে যায় সীমান্তের দিকে। সুযোগ বুঝে সুবিধাজনক স্থানে কোন গিরিবর্ত্ম বা উপত্যকার মাঝে আক্রমণ চালিয়ে সুলতানের বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করাই হল উদ্দেশ্য। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পরাজিত করাও সম্ভব।

তবে খ্যাতনামা বীরেরা সবাই প্রায় থেকে গেল চিতোরে। সুলতানের অবরোধ কালে তারা সামনে থেকে আক্রমণ চালাবে। এদের সুবিধা এই যে আলাউদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে থাকবে নীচে। তাছাড়া কয়েকটি দল অন্য পথে নীচে নেমে পেছন থেকে বিরাট বাহিনীর রসদের যোগান বন্ধ করে দেবার জন্য সব সময় তৎপর থাকবে।

রাণা লক্ষ্মণসিং-এর দিনের অধিকাংশ সময় কাটে রাজসভায়। প্রতি মুহূর্তে নির্দেশদানের জন্যে তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাকে সাহায্য করছে ভীমসিং।

ভীমসিং একটু মনমরা। রাণাকে বলে—পদ্মিনীর জন্যে শেষে এই আক্রমণ সত্যিই সুরু হল। আমি কখনো ভাবতে পারিনি।

—শক্তিশালীর ছলের অভাব হয় না।

—নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

—এসব ভেবে মনকে গোড়া থেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। আপনার অপরাধ কোথায়?

—পদ্মিনীর সৌন্দর্যে আমি প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। নিজের ক্ষমতার তুলনায় আরও উঁচুদরের সামগ্রীর দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম। ভাবিনি, তার জন্যে মেবারের বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

—আসুক। ক্ষতি কি? তবু তো দিল্লীর সুলতান জানতে পারল তার হারেমে এমন সৌন্দর্য নেই। এ আমাদের গর্বের বিষয়।

—এত সহজ ভাবে কি করে কথা বলছ? ভাবনা হচ্ছে না?

—আমার একমাত্র ভাবনা, যুদ্ধে কি করে জয়ী হব।

ভীমসিং নির্বাক।

ওদিকে অন্তঃপুরে পদ্মিনী চঞ্চল। বাতায়ন পথে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ফেলে সে চেয়ে রয়েছে অনেক দূরের ধোঁয়াটে ঐ পাহাড় শ্রেণীর দিকে। ওদিক দিয়েই দিল্লী যাবার পথ। ওই পথ ধরে আসছে ওরা। মেবারের সৈন্যরা ওদের বাধা

দিতে সুরু করেছে। তবু ওরা আসবে। সংখ্যায় ওরা অনেক। গুনে শেষ করা যায় না।

কিন্তু কেন? সব কিছুর মূলে সে। না, সে নয়। তার এই সৌন্দর্য।

পদ্মিনী তার ওড়না ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কাঁচুলি টান দিয়ে খুলে ফেলে। নিম্নবাসও খসে পড়ে যায় মেঝের ওপর। আরশীর দিকে চেয়ে ভাবে, এই তো সৌন্দর্য। এর জন্যেই এত। ছুটে যায় পালঙ্কের কাছে। গুপ্তস্থান থেকে হাতে তুলে নেয় সুদৃশ্য ছুরিকা। কারুকার্যময় তার হাতল। শক্তমুঠিতে সেটি চেপে ধরে বিড় বিড় করে বলে—এখনি এই সৌন্দর্যকে রক্তাক্ত আর কুৎসিত করে তোলা যায়। কিছুই নয়। তখন যে রক্ত মাটিতে ঝরে পড়বে সেই একই রক্ত সমস্ত মানুষের দেহ থেকেই বার হয়। একটুও পার্থক্য নেই। শুধু তার দেহের ত্বক একটু বেশী মাত্রায় মসৃণ। তার গায়ের রঙ রক্তিম গৌরবর্ণ। তার মুখ চোখ নাক ইত্যাদি পৃথিবীর মানুষের তুলনায় নিখুঁত। যে জিনিস দুর্লভ তারই ওপর মানুষের যত আকর্ষণ। আজ যদি দেশের সব নারীই তার মত দেখতে হত, তাহলে কি এই সৌন্দর্যের কদর থাকত? তাহলে বোধ হয়, যারা এখন মানুষের এদের বিচারে সাধারণ এবং সাদামাটা তারই অপূর্ব রূপবতী বলে বিখ্যাত হত।

দ্বারে করাঘাতের শব্দ। তাড়াতাড়ি বেশবাস সামলে নিয়ে দরজা খোলে। তারই নিজস্ব পরিচারিকা রত্না দাঁড়িয়ে।

—আপনি কি অসুস্থ রাণী?

—না না। অসুস্থ হব কেন? তেমন দেখাচ্ছে নাকি?

—মুখ চোখ গোলাপের পাপড়ির মত রাঙা হয়ে উঠেছে।

—ও কিছু না। রাতে ঘুম হয় নি ভাল।

—কি করে হবে? সবই তো বুঝি।

পদ্মিনী তির্যক দৃষ্টি হেনে বলে,—বুঝিস? কি বুঝিস?

রত্না সঙ্কুচিত হয়। বলে,—না, সুলতান আসছে তো?

পদ্মিনী ভাবে এরা মুখে মুখে যতই সহানুভূতি দেখাক মনে মনে নিশ্চয় তাকেই দায়ী করে। তারই জন্য এরা এদের পুত্র হারাবে, স্বামী হারাবে। তারই জন্যে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হবে। সারি সারি দাঁড়িয়ে একের পর এক সেই আগুনে ঝাঁপ দেবে।

উত্তেজিত কণ্ঠে রত্নার দিকে চেয়ে সে বলে ওঠে,—আমারই জন্যে তোদের কত দুর্গতি। তাই তো?

—সে কি কথা? না না। অমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনার জন্যে হতে যাবে কেন? ছি ছি। একথা ভাবাও পাপ।

—তবে কার জন্যে? বল্। বল্ দেখি?

রত্না জবাব দিতে পারে না। পদ্মিনী হেসে ওঠে। সে ভাবে নিজের দেহকে নিজের হাতে ক্ষতবিক্ষত করা অসম্ভব। কষ্ট হবে। অস্বীকার করতে পারে না নিজের রূপের প্রতি তার অগাধ মোহ। এই রূপকে বিকৃত করতে পারবে না। তাছাড়া স্বামী দারুণ আঘাত পাবে। পুরুষের ভালবাসা অনেক নারী পায়। কিন্তু এই ভালবাসার উদ্দামতা নির্ভর করে নারীর রূপের ওপর। পুরুষের উদ্দামতায় নারীদের বড় লোভ। এরই জন্যে তাদের যত রূপচর্চা। কোন রূপসী নারীকে দেখলে অন্য নারীর ঈর্ষা বোধের কারণ আর কিছু নয়। তারা নিজেদের অভিশাপ দেয় রূপসী নয় বলে। ভগবানকেও দোষ দিতে ছাড়ে না। তারপর সব ক্ষেত্রে যেমন হয়—সান্ত্বনার যুক্তি খাড়া করে। নইলে মন যে প্রবোধ মানে না। ভাবে, দরকার কি অত রূপের? রূপই কি আসল? তার স্বামীর তার প্রতি কত প্রগাঢ় ভালবাসা। পদ্মিনী মনে মনে জানে, ওরা পুরুষের স্বভাবের বিশেষ একটা দিক জীবনে আস্বাদনই করতে পাবে না কখনো। ভীমসিং-এর উদ্দামতার তো অন্য কোন কারণ নেই। কেমন সুন্দর মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। অমন অবস্থায় নিজের পুরুষকে দেখতে কার না সাধ জাগে? তাই নিজের দেহকে বিকৃত করতে পারবে না সে কখনই।

কিন্তু বিষপান করা যেতে পারে। আজ যদি সে বিষপান করে, তবে নিশ্চয় আলাউদ্দিন ফিরে যাবে। প্রথমে হয়ত সে বিশ্বাস করতে চাইবে না। তারপর তার মৃতদেহ যদি আলাউদ্দিনের শিবিরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনা যায় তাহলে অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকবে না।

রত্নার দিকে চেয়ে পদ্মিনী বলে—ইচ্ছে করলে সহজেই তোরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারিস।

আগ্রহে রত্নার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে,—কেমন করে রাণীমা?

পদ্মিনী একটু ইতস্তত করে। তারপর এগিয়ে গিয়ে রত্নার কাছে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—বিষ। একটু বিষ এনে দিতে পারিস?

রত্না সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—এ কি সর্বোনেশে কথা! না না, রাণীমা একথা মনেও স্থান দেবেন না। আপনি নিজেকে অপরাধী ভাবছেন কেন? আমরা কি রাজপুত রমণী নই? আমাদের দেহে কাদের রক্ত? আমরা কোন দেবতার পুজো করি? গৌরী মা কি আমাদের দেবী নন? সেদিন বসন্ত উৎসবের

দিনে শোভাযাত্রায় আবীর নিয়ে কারা খেলা করল? সাবিত্রীব্রত কারা উদ্‌যাপন করে? কারা অরণ্য-ষষ্ঠীর দিনে বনের দিকে ছুটে যায়? কারা স্বপ্ন খড়্গের দিনে তাদের স্বামী পুত্রকে নিজের হাতে অস্ত্র সজ্জিত করে দেয়? কাদের একমাত্র কামনা তাদের স্বামী-পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত রক্ত ঢেলে দিয়ে অক্ষয় ভানুলোকের বাসিন্দা হোক? না না, রাণীমা—

পদ্মিনী থরথর করে কাঁপতে থাকে। সে নতুন করে যেন চিনতে পারে মেবারকে। নিজ হাতে রত্নার মুখ চেপে ধরে বলে,—চুপ কর। চুপ কর রত্না। আর বলিস না। আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। আমার অন্যায় হয়েছে। আর শুনতে চাই না আমি। সব বুঝেছি।

তবু শান্ত হতে রত্নার অনেক সময় লেগে যায়। তার খেয়াল থাকে না রাণীমার কথায় আকুতি ঝরে পড়ছে।

খবর আসে অগ্রবর্তী প্রতিরোধ বাহিনীর কিছু কিছু সাফল্য সত্ত্বেও দিল্লীর বাহিনী ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তবে গতি তাদের খুব মন্থর। তারা ভাল মতো বুঝতে পেরেছে, মেবার কোন রকম সমঝোতার ধার ধারে না। আলাউদ্দিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তার আগমন সংবাদ পেয়ে মেবারের রাণা দূত পাঠিয়ে অন্তত যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করবে। তাই বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে ঝটিকা গতিতে এগিয়ে আসছিল তার সৈন্যদল। কিন্তু মেবারের সীমান্ত পার হবার প্রথম রাতেই আঘাত আসে। একটু অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে এই আঘাতের মোকাবিলা করতে হয়। প্রথম রাতেই নিহত আর আহতের সংখ্যা মিলে দাঁড়ায় প্রায় শ'খানেক।

সুলতান দাঁতে দাঁত চেপে একটা কঠোর প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করে। সেই থেকে বাহিনীর গতি যথেষ্ট সংযত এবং সিপাহীরা সদা-সতর্ক।

ওদিকে চিতোরগড়ে আয়োজনের শেষ নেই। সম্মুখরণই যুদ্ধ জয়ের শেষ কথা নয়। সুলতানের অবরোধ কালে যাতে খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তরের একটি অতি-সংকীর্ণ খাড়া পথ দিয়ে খাদ্যবস্তু আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলাউদ্দিনের ক্ষমতা হবে না এই চোরা-পথের সন্ধান পাওয়া। চিতোরবাসী অনেকেরও এর সন্ধান জানা নেই। ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকারে এই পথে খাদ্য আনার মহড়া হয়ে গিয়েছে। বাদলের আগ্রহাতিশয্যে জগত সিং-এর ওপর ভার পড়েছে এই পথটি সর্বক্ষণ আগলে থাকার। একশো জন বিশ্বস্ত রাজপুত দলের সে এখন সর্বময় কর্তা। তাকে

দেখতে হবে রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই পথে ঠিকমত আসছে কিনা। তাকে আরও দেখতে হবে শত্রু পক্ষের একজনও যাতে এই পথে রাজধানীতে প্রবেশ করতে না পারে। অতীতে একবার নাকি তেমন হয়েছিল। চিতোরের অধিবাসীরা যখন সম্মুখ রণে জয়ী ভেবে উল্লসিত ঠিক তখনই তাদের নগরীর মধ্যে শত্রু সৈন্য প্রবেশ করে পেছন থেকে আক্রমণ স্বরু করেছিল। অনেক বীরের পরাক্রম আর জীবনের বিনিময়ে কোনরকমে রক্ষা পেয়েছিল চিতোর সেবারে।

এভাবে পেছনে পড়ে থাকতে জগত সিং চায় নি। সে চেয়েছিল বাদলের মত সে-ও সামনে এগিয়ে যাবে। যুদ্ধ করবে স্বলতান-বাহিনীর সঙ্গে। এককালে ওই সৈন্য দলে সে-ও ছিল একজন। ওদের কলাকৌশল তার জানা আছে।

সে রাজপুতের মত মরতে চায়। তারও লক্ষ্য এখন ভানুলোক। কিন্তু সেকথা মুখফুটে বলতে পারেনি। আদেশ-পালন করার শিক্ষাই সে পেয়ে এসেছে তার বাবার কাছে এবং স্বলতানের বাহিনীতে সমর-শিক্ষার সময়। নিজের মনের মত কাজ নেবার কথা কল্পনা করতে পারে না।

দলের একশোজন লোক নিয়ে সে প্রথমে দুএকদিন সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নেয়। তারপরে সবাইকে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে তালিম দিতে স্বরু করে। সে নিজে তীর ধনুকে ওস্তাদ নয়। কিন্তু সে চেয়েছিল তার দলের অধিকাংশ যেন দক্ষ তীরন্দাজ হয়। রাণা তার ইচ্ছা পূরণ করেছে। তবু কয়েকটি কঠোর নির্দেশ দিয়ে দেয় সে তার দলকে। প্রথমতঃ সিদ্ধি কিংবা আফিম ত্যাগ করতে হবে দীর্ঘদিনের জন্যে। তার প্রথম নির্দেশেই দলের মধ্যে গুঞ্জন স্বরু হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, প্রথম দিনেই দলপতি হিসাবে সে অপ্রিয় হয়ে গেল। কিন্তু নেশার বিপদের কথা খুব স্পষ্ট ভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দেবার পর কেউ আর কোনরকম আপত্তি করতে পারেনি। তার কথা দেশের মঙ্গলের জন্যে ওরা মেনে নেয়। এ ছাড়া নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্যে আরও কয়েকটি নিয়ম সে বেঁধে দেয়।

এই ব্যস্ততার মধ্যেও বাবারামের কাছ থেকে বারবার অনুরোধ আসতে থাকে, একবার দেখা করার জন্য। বিরক্ত বোধ করে জগত। এই সময়ে মানসিক স্থৈর্য আর অবিচলতার প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু বাবারামের আহ্বান তাকে চঞ্চল করে তোলে। বাবারামের অভিপ্রায় তার অজানা নয়। লীলাবাঈ এর সঙ্গে তার বিবাহ মিটিয়ে ফেলতে চায় বৃদ্ধ।

লীলাবাঈএর চোখের স্ফুলিঙ্গ ভুলে যাবার নয়। সেই স্ফুলিঙ্গ আদৌ অনুরাগের নয়। তবু সেই অবস্থাতেও লীলাবাঈ-এর সুরেলা কণ্ঠস্বর মুগ্ধ করেছিল জগতসিংকে। তাছাড়া তার রূপ? পদ্মিনীকে এখনো দেখার সৌভাগ্য হয় নি তার। কিন্তু লীলাবাঈকে এক কথায় রূপসী বলবে সবাই। আর সেই রূপের সঙ্গে রয়েছে অপরূপ দেহবল্লরী। ঠিক যাকে বলে বীরাঙ্গনা। মেয়েটি নিশ্চয় অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শিনী। জগতসিং-এর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় তার প্রতি মেয়েটির বিদ্বেষ কখনই স্থায়ী হবে না। বিয়ের পরে আস্তে আস্তে ভুল ভাঙবে। তাকে ভালবাসতে সুরু করবে। ভবিষ্যতের সেই রঙীন কল্পনায় তন্ময় হয়ে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু পারে না। কল্পনা ঠিক দানা বেঁধে উঠতে পারে না। বাস্তবের সঙ্গে বড় বেশী পার্থক্য।

তবু সে বাবারামের কাছে যেত না। ভেবেছিল আলাউদ্দিন এসে গেলে এই প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যাবে। তারপরে যুদ্ধে সে নিহত হলে সবতো চুকে বুকেই গেল। কিন্তু একদিন শক্তি নিজে এল তাকে ডাকতে। শক্তি দেখতে এখনো অনেকটা কিশোরের মত। কিন্তু তার বুদ্ধি পরিপক্ক বলেই মনে হয়।

তাই জগত তাকে বলে—আমাকে উনি কেন ডাকছেন তুমিও জান। কিন্তু আমার মনে দ্বিধা। আমি না বুঝে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। তোমার দাদুকে বুঝিয়ে বল তোমরা। তোমার বোন আমাকে সহ্য করতে পাবে না। তবে কেন এভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট করছে?

শক্তি জবাব দেয় না। সে আদেশ পালন করতে এসেছে। নিজের মতামত জানাতে নয়।

জগত সিং তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে—তুমি খুবই কর্তব্যপরায়ণ, তাই না শক্তি সিং? বাইরে থেকে দেখলে সবাই বাহবা দেবে। রাজপুতদের এই বাহবার প্রতি বেশ একটা মোহ আছে। এই কয়েকমাসে সেই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। কিন্তু নিজের মায়ের পেটের বোনের প্রতি তোমার এতটুকুও কি কর্তব্য নেই? সেই কর্তব্য কে তবে পালন করবে? তোমার দাদু বৃদ্ধ। দুদিন বাদে তিনি আর এই পৃথিবীতে থাকবেন না। কিন্তু যে মেয়েটি বহুদিন বেঁচে থাকবে এখনো, তাকে এভাবে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার পথটা খুলে দিচ্ছ কেন? অদ্ভুত তোমাদের কর্তব্যবোধ।

শক্তি সিং চকিতে জগতের দিকে চায়। জগতের মুখে তখন বিরক্তি আর বিদ্রূপ একসঙ্গে খেলা করে চলেছে। দেখে সে বিস্মিত হয়। একটা কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়।

জগত হেসে বলে—তবুও তুমি নীরব। ভাবছ, যোগ্য রাজপুতের ভূমিকা পালন করছ। ভুল ধারণা তোমার। একে যদি রাজপুত চরিত্র বল, তাহলে বুঝতে হবে রাজপুতদের মধ্যে মানবতা-বোধ বলতে কিছু নেই।

শক্তি এবারে আর চুপ করে থাকতে পারে না। সে বলে—আমার ভগিনী যদি বোঝে সে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তাহলে নিজেকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার মত সামর্থ তার রয়েছে।

—স্বামীর ঘর ত্যাগ করবে বুঝি ?

—সেটা আপনাদের ওই দিল্লীতেই শোভা পায় শুনেছি। এখানে ওসব কথা কেউ ভাবে না। সে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নেবে পৃথিবী থেকে।

—চমৎকার। আত্মহত্যা করবে ? এটাও বুঝি বীরত্বের মধ্যে পড়ে ? অথচ এখনো নিজেকে রক্ষা করার পথ তার সামনে খোলাই পড়ে রয়েছে।

শক্তি কাঁপতে থাকে। এই কাঁপুনিতে কতটা ক্রোধ রয়েছে বুঝতে পারে না জগত। সে নির্বিকার কণ্ঠে বলে—আমি আজ সন্ধ্যায় যাব।

আলাউদ্দিন চিতোরের গোড়ায় এসে উপস্থিত হয় অবশেষে। পথে তাকে অনেকবার যুঝতে হয়েছে খণ্ড খণ্ড মেবার বাহিনীর সঙ্গে। ক্ষয় ক্ষতিও কম হয়নি। একদিন সে নিজেই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে বরাত জোরে। মেবারবাসীরা ধুরন্ধর তীরন্দাজ একথা তার অজানা ছিল না। কিন্তু তীর ধনুককে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারে তারা যে এতখানি দক্ষ এ-খবর জানা ছিল না। একটি তীর এসে যখন তার এক হাত দূরের দেহরক্ষীর কণ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ হল তখন সে চাক্ষুষ প্রমাণ পেল। কোন সন্দেহ নেই ওটি তাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

আলাউদ্দিন জানত চিতোর দুর্ভেদ্য। তাই ঝটিকা-গতিতে প্রথম দিনেই ওপরে ওঠার চেষ্টা করল না। অবরোধের আয়োজন স্থরু করে দিল। সামনে ব্যূহ সাজিয়ে পেছনে পরিখা খননের কাজ স্থরু হল। আর বেছে নেওয়া হল চিতোরের দক্ষিণ দিক।

আলাউদ্দিন অন্য সব দিকেও অশ্বারোহী দল প্রেরণের ব্যবস্থা করল। উদ্দেশ্য হল চিতোরে সব রকমের সরবরাহ যাতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারল না তারও পেছনে একদল রাজপুত গোপনে ওই একই উদ্দেশ্যে কড়া পাহারা দিচ্ছে। আলাউদ্দিনের সরবরাহ ব্যবস্থা তছনছ করে দেওয়া ছাড়াও তাদের আর একটি লক্ষ্য হল নিজেদের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা। আর

এতে আলাউদ্দিনের দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে—এ তো জানা কথা। কারণ অতি-কুশলী দিল্লীর সুলতান চিতোরের একদিকে পরিখা খনন করে অন্য দিকগুলো ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে পারে না।

পরিখা খননের কাজ শেষ করতে আলাউদ্দিনের কয়েকদিন কেটে যায়। এর মধ্যে সে একবারও মুখ তুলে চারদিকটা দেখেনি। কাজ আগে। কাজের সময় কোনরকম গাফিলতি সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। তার নিজের মধ্যেও একবিন্দু ফাঁকি নেই। তার চরিত্রের এই বলিষ্ঠ দিকই তাকে সার্থক যোদ্ধা হতে সাহায্য করেছে।

দুদিন পর পরিখার কাজ শেষ হলে সুলতান যখন মুখ তুলে চারদিক ভাল-ভাবে দেখতে লাগল সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে। পাশের পত্র-বিহীন একটি শিমুল গাছের গোড়ায় পা রেখে সে মনসুরকে ডাকে।

মনসুর অসমতল জমির ওপর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

আলাউদ্দিনের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। চিতোর পাহাড়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে সে বল্লে,—ওটা কি দেখছ মনসুর?

মনসুর ঠিক বুঝতে না পেরে কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। চিতোর নগরীকে সুলতান চেনে না এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে সুলতান কি দেখাতে চাইছে তাকে?

সে দ্বিধায় বলে—কোনটা জাঁহাপনা।

—আমি বিশেষ কোন কিছু দেখাচ্ছি না।

—তবে কি আপনি চিতোর নগরীর কথা বলছেন?

আলাউদ্দিন হাসতে হাসতে ঘাড় ঝাঁকাতে থাকে। তারপর আবার আঙুল তুলে একটা বিশেষ কিছুকে দেখিয়ে বলে—আর ওটা কি?

এবারে মনসুর সত্যিই মুশকিলে পড়ে। চিতোর নগরীর চারদিক প্রাকার বেষ্টিত। সুলতান কি তাই দেখাচ্ছে? কিংবা প্রাকারের মাঝে মাঝে ওই প্রহরার স্থানগুলো? অথবা তার পেছনের অট্টালিকা?

সে করুণ কণ্ঠে বলে—অপরাধ নেবেন না খোদাবন্দ্। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—পারছো না? আমাকে উসকে দিয়ে এখন নিজেই অন্ধ সেজে বসে আছ?

মনসুরের হৃদকম্প সুরু হয়। সুলতানের মন্তব্যে বিরক্তি না বিদ্রূপ? তার কথায় কি কৌতুক? মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় মনসুরের।

আলাউদ্দিন একটু হেসে বলে—ওই যে সূর্যের লাল আলো আটকে রয়েছে? আর কোথাও সূর্যের শেষ-বেলার রশ্মি নেই। শুধু ওই যে ওইখানে। দেখছো মনসুর?

—হ্যাঁ হুজুর। স্পষ্ট দেখছি। ওটাই তো গড়।

—হুঁ। গড়। মানে, কেল্লা। ওখানে কে রয়েছে?

—মেহেরবান, ওখানেই রাণা থাকেন বলে শুনেছি।

—অবশ্যই থাকে। আর কে থাকে?

—তাঁর পরিবার।

—বুরবক। ওখানে থাকে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী। পদ্মিনী। তোমার তৈরী ঝঞ্ঝাটের আসল বস্তুটি।

চকিতে মনসুরের মগজ বিলকুল সাফ হয়ে যায়। সে মুখে বোকার হাসি ফুটিয়ে বিগলিত স্বরে বলে,—হ্যাঁ হুজুর। আপনার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

—কি বললে? আবার বল।

—তিনি নিশ্চয় শুনেছেন সব। বুঝে গিয়েছেন দিল্লীর জবরদস্ত সুলতানের নজরে একবার যখন পড়েছেন তখন আর উপায় নেই। মনে মনে ভীমসিংকে বাতিল করে দিয়ে হৃদয়ে আপনার মসনদ মজবুত করে ফেলেছেন এরমধ্যে।

আলাউদ্দিন একদৃষ্টে মনসুরের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। মনসুরের হাঁটুর কাছে অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে হতে থাকে। ভাবে, মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না তো? মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে। কি অপরাধ করে ফেলল রে বাবা। সে জান কবুল করে সুলতানের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছে।

সুলতান ভারী গলায় বলে—রাজপুতদের তুমি চেনো না। চোখ কান খোলা রেখো। চিনতে পারবে।

—নিশ্চই খোলা রাখব হুজুর। তবে পদ্মিনীর স্থান আপনার হারেমে বাঁধা।

—তাহলে বুঝব আমার ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন।

মনসুর হাঁ হয়ে যায়। সুলতানের কথায় এমন বৈরাগ্য ফুটে উঠতে জন্মেও শোনেনি সে।

সূর্যমহল ডিঙিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে একটি বড় কক্ষে পদ্মিনীকে ঘিরে অন্তঃপুরের রমণীকুল। রাত অনেক হয়েছে। কয়েকদিন হল নিজের নিজের স্বামীপুত্রের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলছে। সবাই ব্যস্ত আলাউদ্দিনের

অবরোধ চুরমার করে দেবার প্রচেষ্টায়। গোরা আর বাদল এরমধ্যেই কয়েক-বার সামনে থেকে সুলতানের বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। খুন জখমও হয়েছে উভয় পক্ষের। তবে সুলতানের ক্ষতির পরিমাণ একটু বেশী। কারণ তারা পরিখা খনন করলেও নীচে রয়েছে। ওপর থেকে গোরা আর বাদলের দলের তীরন্দাজরা বেশ সফল হয়েছে। তবে এতে দিল্লীর সুলতানের গায়ে ফোস্কাও পড়ে না।

রাণা লক্ষ্মণসিং স্বয়ং রাতের অন্ধকারে রসদ সরবরাহের চোরা-পথে সমতলে গিয়ে কৃষকদের বলে এসেছে তারা যেন তাদের নিজেদের কাজকর্ম যথারীতি চালিয়ে যায়। আর বলেছে, কোন রকম নতুন কিছু দেখলে বা শুনলে চিতোরের উত্তরের বুড়ো অশ্বথ গাছের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়। সেখানে ধুনি জ্বালিয়ে শিষ্য পরিবৃত হয়ে বসে রয়েছে যে সাধু, আসলে সে সাধু নয়। রাণার নিজের লোক।

বাইরে পুরুষেরা যখন অতি ব্যস্ত ভেতরে রমণীগণ তখন পদ্মিনীর নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়েছে। পদ্মিনীর এই মূর্তি চিতোরের মেয়েরা আগে কখনো দেখেনি। তারা দেখছে আর শুনছে পদ্মিনীর ভাবভঙ্গি আর তার আগুন জ্বালানো কথাবার্তা।

পদ্মিনী বলছে,—তোমরা রামায়ণ পড়েছ। প্রমীলাকে তোমরা জান। সে রাক্ষসী হতে পারে, কিন্তু স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা তো মিথ্যা নয়। তার এই নিখাদ ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তির কাছে মানবদেহধারী স্বয়ং নারায়ণ পর্যন্ত পরাভূত হয়েছিলেন। সে যা পেরেছিল, তোমরা তা পারবে না?

—কেন পারব না। নিশ্চয় পারব।

গোরার স্ত্রী কলাবতী বলে—স্বামীর সোহাগে কোন্ রমণী না গলে? স্বামীকে সেবাযত্ন কে না করে? কিন্তু আমি জানি প্রতিটি রাজপুতানী তার মনকে ইস্পাত কঠিন করে তুলতে পারে। তারা অনেকেই অস্ত্র বিদ্যায় দক্ষ।

পদ্মিনী বলে—আলাউদ্দিন এসেছে। আসুক। সে বুঝে যাক, রাজপুত রমণীকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে ভাবলে অনুশোচনা করতে হয়। সে দেখে যাক, তারা যুদ্ধবিদ্যাও জানে। আমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাব। শুধু শুধু জহরব্রত অনুষ্ঠান করে জীবন দিয়ে কী লাভ? তাতে তো প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। আমরা শত্রুদের আঘাত হানতে চাই। আমরা আমাদের পুরুষদের সাহায্য করতে চাই।

একজন বলে ওঠে,—কিন্তু যদি ওদের হাতে বন্দী হই?

আর একজন মন্তব্য করে,—হই হব।

কলাবতী বলে—জিনিসটা অত সহজ নয় হীরাবাঈ। একজন পুরুষ বন্দী হওয়া আর আমাদের বন্দী হওয়া অনেক তফাৎ। বুঝতে পারো না?

রমণীদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। এদিকটা তারা উত্তেজনার বশে প্রথমে ভেবে দেখেনি। তারা সবাই পদ্মিনীর দিকে চায়।

পদ্মিনী নিজেও ক্ষণেকের জন্যে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারপর বিদ্যুৎ চমকের মত তার মাথায় একটা উপায় আসে।

সে ধীরে ধীরে বলে—জীবিত অবস্থায় যাতে আমরা বন্দী না হই, সেই পথও রয়েছে।

কলাবতী বলে—ছুরি? নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়া? কিন্তু তাতে নিশ্চিত মরণ হবে কিনা কে বলতে পারে?

—না কলাবতী ছুরি নয়। আমাদের দেখতে হবে ওদের হাতে যেন আমাদের মৃত দেহই পড়ে। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে থাকবে বিষ।

—বিষ হ্যাঁ বিষ।

একটা সুরাহা হয়ে যাবার জন্যে স্বস্তির গুঞ্জন ওঠে এবারে।

একজন প্রশ্ন তোলে,—কিন্তু এত বিষ কোথায় পাওয়া যাবে?

পদ্মিনী বলে,—এরজন্যে রাণার সাহায্য প্রয়োজন।

হীরাবাঈ বলে,—অস্ত্রের জন্যেও তাঁর সাহায্যের দরকার হবে। কিন্তু তিনি কি সম্মতি দেবেন?

পদ্মিনী বলে—আমরা চেষ্টা করব।

—কিন্তু কখন আমরা বুঝব যে আমাদের সুরু করতে হবে?

—যখন দেখব পরাজয় অবধারিত। যখন দেখব যে আমাদের বীরদের অধিকাংশই নিহত। যখন দেখব সুলতানের বাহিনী নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে। আমরাই তখন হব চিতোরের শেষরক্ষা ব্যূহ। বাকীদের জন্য তো জহরব্রত রয়েছেই।

—তাহলে কাল থেকেই যে চিতোরের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। সবাইকে ডাকতে হবে।

—হ্যাঁ। সবাইকে বলতে হবে গড়ের ময়দানে এসে জড়ো হতে। সেখানে দেখতে হবে কে কোন্ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। যারা অনেকদিন এসব নাড়াচাড়া করেনি তাদের অভ্যস্থ করে নিতে হবে।

এই আলোচনা চলার সময় বাদল যাচ্ছিল সেই কক্ষ অতিক্রম করে। ভেতরে কথাবার্তা শুনে প্রবেশ করেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সূর্যমহলের এত

কাছে এই ঘোর বিপদের দিনে মহিলাদের আসর বসতে পারে, মাথায় আসেনি তার। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে চলে যেতে উদ্যত হতে পদ্মিনী ডাকে তাকে।

সে সঙ্কুচিত হয়ে বলে—আমার ভুল হয়েছিল। আপনারা রয়েছেন জানতাম না।

—তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই বাদল। আমরা বিশেষ কারণে একত্রিত হয়েছি। তোমাকে খুলে বলছি। তোমার ওপর ভার থাকবে কালকের মধ্যেই রাণাকে কথাটা জানাতে।

—আদেশ করুন।

পদ্মিনী তাদের পরিকল্পনার কথা একে একে বুঝিয়ে বলে বাদলকে। সব শোনা হলে, এদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় বাদল অভিভূত হয়ে পড়ে। বিস্মিতও কম হয় না। হয়ত এদের পরিকল্পনা বাস্তবতার মাপ কাঠিতে পুরোপুরি নিখুঁত নাও হতে পারে। হয়ত মহারাণা এবং ভীমসিং এতে রাজী হবেন না। তবু একে অভিনব বলে স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এরা যে কত প্রগতিশীলা এতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। জহরব্রতের মত চিরাচরিত একটি প্রথাকে প্রায় অস্বীকার করার মত মানসিক শক্তি এদের আছে। কারণ এরা অনুভব করেছে জহরব্রতের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কতকগুলো প্রাণের অনর্থক অপচয় হয়। অথচ এদের পথে যদি এরা চলতে পারে তাহলে শত্রুদের কিছুটা বাধা সৃষ্টি করা যায়। অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে যদি পতিকে অনুসরণ করা যায়, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে প্রাণ দিলে সেই অনুসরণের গতি বরং আরও দ্রুত হবে।

পদ্মিনীর পদধূলি নিয়ে বাদল বলে,—আমি প্রথম সুযোগেই মহারাণাকে সবকিছু জানাব।

পদ্মিনী বলে,—আমিও বলতে পারতাম নিজে। তাতে সময় নষ্ট। তোমার সঙ্গে মহারাণার দেখা অনেক বেশী হয়। তুমি বুঝতে পারবে কোন্ সময় তিনি ব্যস্ত নন।

বাদল মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে জগৎসিং নিষ্কৃতি পেল না। বাবারাম সিং-এর আকুল অনুরোধে লীলাবাঈকে বিয়ে করে ঘরে আনতে হল। বাবারাম শয্যাশায়ী। তাকে দেখলেই বোঝা যায় শেষের দিনটি ঘনিয়ে আসতে বিশেষ দেরী নেই। উচ্চাসন থেকে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে তার জীবনীশক্তি দ্রুত

নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে নতুন করে নিজের বিশ্বস্ততার বা নিপুণতার প্রমাণ দেবার সময় পাওয়া যায় না।

জগত বলেছিল, তার জীবন এখন অনিশ্চিত। যে কোন মুহূর্তে আলাউদ্দিন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে চিতোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এর ফলাফল বাবারামের চেয়ে ভাল বুঝবে কে ? রাজপুত হিসাবে জগত সিং-এর জীবন এই অবস্থায় খুবই অনিশ্চিত।

বাবারামের যুক্তি অকাট্য। সে বলল, জগতের মৃত্যু হলেও কিছু এসে যায় না। কারণ সেক্ষেত্রে লীলাবাঈ রাজপুত রমণী হিসাবে তারই অনুগামিনী হবে অন্যান্য বিবাহিতা রমণীর মত। লীলার পক্ষে এ তো মহা ভাগ্যের। কারণ কুমারী অবস্থায় সুলতানবাহিনীর ভোগ্য বস্তু হয়ে শেষে পণ্য হিসাবে দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছতে হবে না।

জগত একথার কোন জবাব দিতে পারেনি। সুতরাং লীলাবাঈ তার সহধর্মিনী। বিবাহ বাসরে জন সমাগম মোটেও হয়নি। ছিল শুধু শম্ভু সিং। আর শত কাজ ফেলেও বাদল একবার এসে ঘুরে গিয়েছিল। প্রথমে সে বাবারামের গৃহে পদার্পন করতে রাজী হয়নি। কিন্তু জগত যখন বুঝিয়ে বলল, বাবারাম তার বাবারই সব চেয়ে বড় শত্রু, তখন আর আপত্তি করেনি। যথেষ্ট ভদ্রতা আর উদারতার পরিচয় দিয়েছে সে।

বিবাহের দুদিন পরে নিজের কুটিরে রাতের বেলায় লীলাবাঈএর সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পায় জগতসিং। লীলার মন তার প্রতি বিরূপ ঠিকই। কিন্তু সেই বিরূপতা স্ত্রী হয়ে আর কতদিন পুষে রাখবে ? একদিন না একদিন তাকে পছন্দ করতে সুরু করবে। আর একবার পছন্দ করলে হৃদয়ে অনুরাগেরও সঞ্চার হবে। কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটিয়ে তুলতে হলে ধৈর্য ধরতে হয়। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দেরি নাও হতে পারে। কারণ লীলা জানে চিতোরের যুবকেরা যে কোন মুহূর্তে মরণ পণ যুদ্ধে রত হতে পারে।

লীলা বসে ছিল কুটিরের একমাত্র পালঙ্কে। আর কেউ নেই আশেপাশে। প্রতিবেশীর গৃহটি কাছে হলেও, এত রাতে তারা কেউ বাইরে নেই। আজ এখন থেকেই এই ছোট্ট সংসারের ভার একা লীলার ওপর। বস্তুত ইতিমধ্যেই লীলা খাদ্য প্রস্তুত করেছে। আসন করে বসিয়ে তাকে খেতে দিয়েছে। নিজেও খেয়ে নিয়েছে। তারপর পালঙ্কে এসে বসেছে।

জগতসিং লীলাবাঈএর সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে চায়। এ পর্যন্ত চারচোখের মিলন হয়নি। বিয়ের রাতে যতবার তার দিকে চেয়েছে,

দেখেছে লীলার দৃষ্টি অন্য কোথাও। সে এই অনুষ্ঠানের যেন কেউ নয়। কিন্তু আজ নিশ্চয় তেমন হবে না। তার মুখের দিকে চাইতেই হবে।

—আজও কি আমার দিকে চাইবে না লীলা?

—কেন?

—না, এ তো ঠিক স্বাভাবিক নয়। আমি বলছি এ ভাবে থাকা কি সম্ভব?

—খুব সম্ভব।

—তোমারই কষ্ট হবে। অন্ততঃ কথায় বার্তায় স্বাভাবিক হলে অসুবিধা ভোগ করতে হবে না তোমার।

—সে সব আমি বুঝব। কথা তো বলছি। এই ভাবেই চলবো।

—শুধু কথা? আর কিছু নয়?

—তার মানে?

—মানে, শুধু কথাই বলবে? হাসবে না?

—বোধহয় না।

—কেন?

লীলা এবারে কঠিন দৃষ্টি হেনে বলে—সে কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে?

—হয়ত আছে। তবে তার জন্যে তোমাকে চাপ দেব না।

—তোমার দয়া।

জগত ঢোক গিলে বলে,—এই চিতোরেই এককালে আমি জন্মেছিলাম লীলা। আমার বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছিলেন। তখন আমি বালক। দোষ আমার নয়।

—ও সব কথা শুনতে চাই না।

—ও।

লীলা হঠাৎ শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সে তার বিবাহে পাওয়া গালিচাখানা ঘরের কোণে বিছিয়ে দেয়।

—ও কি করছ?

—তোমার ঘর করতে এসেছি, ঘরেই শুতে হবে! আমি এখানে শুচ্ছি।

জগতের মুখে একটা বিষন্ন হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে, এর জন্যে তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। সুন্দর গালিচা শুধু শুধু নষ্ট করবে কেন? তুমি ওপরেই শোও।

—আর তুমি ?

জগত ভাবে, আমি সৈনিক। আমার স্থান তো যুদ্ধক্ষেত্রে। মেবারের কত ছেলে এখন পাহাড় পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করে রয়েছে। কত সৈন্য শত্রুর পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছের নীচে পড়ে থেকে কোন-রকমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম সেরে নিচ্ছে কত যুবক। সুতরাং সে-ও চোরাপথের পাশে একটা জায়গা বেছে নেবে। সেইখানেই থাকবে প্রতি রাতে। তবে প্রতিদিন দিনের বেলায় একবার করে আসতেই হবে। এটি তার কর্তব্য। একা ঘরে একটি তরুণী। তারই বিবাহিতা ভার্যা। তার সুবিধা অসুবিধা দেখতে হবে। কোন্ জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে, দেখে শুনে এনে দিতে হবে। এ বরং ভালই হল। লীলাবাঈ তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দেশের মঙ্গল করেছে। নবপরিণীতা বধুর প্রতি বলা যায় না, মোহ জন্মাতে পারত। তাতে কর্তব্যে অবহেলা হত। সেই ভয় আর থাকল না।

জগত ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—এক কাজ কর লীলাবাঈ। তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়।

—তোমাকে আমার জন্যে বাইরে শুতে হবে না। এ বাড়ী তোমার। যদি মনে কর, এক ঘরে থাকার মত সংযম তোমার নেই, তাহলে আমিই বাইরে গিয়ে শুচ্ছি।

—এ বাড়ী আমার বটে। কিন্তু তাতে তোমারও সমান অধিকার। ওই শয্যাও তোমার। অস্বস্তির কারণ নেই। আমি বাইরে শোব না। চলে যাচ্ছি, যেখানে আমার কাজ। রাতের অন্ধকারেও শত্রুরা ওপথে আসতে পারে। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। দরজা বন্ধ করে দাও।

জগত আর পেছনে ফেরে না। আঙিনায় এসে সে এককালের চুরি করা ঘোড়াটির পিঠে থাবা মেরে বলে,—চল্‌রে। তোর নাম তো তাজ। দোস্ত ইমতিয়াজ খুব সখ করে নামটা রেখেছিল। আমি কিন্তু ও নামে তোকে কখনো ডাকিনি। আজ থেকে তোর নাম হবে সাথী। বুঝলি ? নে, এবারে চল্ দেখি।

সে ঘোড়ায় চেপে বাইরে রাস্তায় গিয়ে পড়ে।

গভীর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে গোরার স্ত্রী কলাবতীর ঘুম ভেঙে যায়। বুকের ভেতরে কাঁপতে থাকে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। কিন্তু যাকে নিয়ে স্বপ্ন, সে তার পাশে বেশ নিশ্চিন্তে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর

গত রাতে একটু দেরি করেই ফিরেছিল গোরা। ক্লান্ত তখন সে। তবে সেই ক্লান্তি তার উৎসাহকে দমাতে পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রের কত কথা শোনালো। শোনালো, তার অতিপ্রিয় এক রাজপুত সেনা কীভাবে অল্পের জন্যে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল। রাজপুতটি একটু বেশী এগিয়ে গিয়েছিল সুলতানের পরিখার দিকে। সে ভেবেছিল তার অস্তিত্ব গোপন রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ চার জন শত্রু সৈন্য একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বার হয়ে তাকে ঘিরে ধরল। তাদের বর্শা উদ্যত। সেই মুহূর্তে একটি তীর ওপর থেকে গিয়ে একজনের চোখে বিঁধল। ঠিক বন্য বরাহ যে ভাবে লুটিয়ে পড়ে আহত হবার পর সেই ভাবে লুটিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। তারপর কিছুদূর গড়িয়ে স্থির হয়ে গেল। বাকী তিনজনের মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগে রাজপুতটি একজনকে বল্লমে বিদ্ধ করে ছুটে চলে আসে।

এই গল্পটি তো গতরাতের। এমনিভাবে রোজই গোরা ফিরে এসে যুদ্ধের টুক্‌রো টুক্‌রো চমকপ্রদ কাহিনী শোনায়। শুনে গা শিরশির করে। সুলতানের সঙ্গে এই ধরনের খণ্ড যুদ্ধই চলেছে এখন। সমগ্র ভাবে আক্রমণ শুরু হয়নি ওদের তরফ থেকে। ভাবছে হয়ত অবরুদ্ধ চিতোরগড়ের খাদ্যের মজুত ধীরে ধীরে কমে আসবে একদিন। তখন আপনা থেকেই সন্ধির প্রস্তাব যাবে রাণার কাছ থেকে। সুলতান জানে না, খাদ্যের সঙ্কট ঘটলে তারই ঘটবে।

কলাবতী ভাবে আজকের এই নিদারুণ দুঃস্বপ্ন সম্ভবতঃ দুশ্চিন্তা থেকে সৃষ্ট। তবু স্বপ্নের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলেই বুক দুরু দুরু করে উঠছে। স্বপ্নের গোড়াতে সহস্র কণ্ঠের হুংকার শুনতে পায় সে, তারপর দেখতে পায় প্রচণ্ড লড়াই সুরু হয়ে গিয়েছে। সেই লড়াই এর দৃশ্যের মধ্যে এক জায়গায় দেখতে পেল তার স্বামী গোরা চারদিক থেকে শত্রু সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার অশ্ব শত্রু সৈন্যদের মধ্যে উন্মত্তের মত ছোটাছুটি করছে। অশ্বটির দেহ বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। রুধির ধারা গড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গ বেয়ে। মুখ দিয়ে ক্রমাগত ফেনা বার হওয়ায় সেই ফেনার শুক্‌নো অংশ শূন্যে ভাসছে। ব্যূহ ভেদ করে অশ্বটি তার প্রভুকে কোন রকমে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার মরণ-পণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তার পিঠের ওপর উপবিষ্ট গোরার অসি সূর্য কিরণে ঝলসে উঠছে। অসি বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। তার বর্মের ওপর অবিরল প্রতিহত হচ্ছে ওদের অস্ত্রাঘাত। তবু গোরা স্থির অবিচল। এতটুকুও বেসামাল হচ্ছে না।

কলাবতী স্বচক্ষে দেখছিল সেই যুদ্ধ। যুদ্ধটা হচ্ছিল প্রাসাদের নীচের ওই প্রাঙ্গণে। সে ওপরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। দেখছিল আর মনে হচ্ছিল তার হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। গোরার অসির আঘাতে একের পর এক শত্রু সেনা ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে। তবু তাদের শেষ নেই। কলাবতী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গৌরী দেবীর নাম নিতে থাকে। যত দেব দেবীর নাম মনে পড়ে সবাইকে সে ডাকতে থাকে।

আর ঠিক সেই সময়—সেই সময় স্বামীর এই মরণ পণ যুদ্ধের মধ্যেও একটা তীব্র নারীকণ্ঠের আর্তনাদ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় অন্য দিকে। দেখতে পায়, যাকে উপলক্ষ্য করে এত কাণ্ড সেই পদ্মিনীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে ঝকমকে পোষাক পরিহিত এক প্রকাণ্ড পুরুষ। সুলতানের সৈন্য বাহিনী আলাউদ্দিনের নামে জয়ধ্বনি করে ওঠে। কলাবতী বুঝতে পারে ওই পুরুষই হল স্বয়ং দিল্লীর সুলতান।

সব শেষ। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল কলাবতী। আর তখন কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। কে? দেখল শত্রুদের মধ্যে থেকে গোরা বলছে—আমি চললাম কলাবতী। তুমি দেরী করো না। কলাবতী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল গোরার অশ্বটি ভূমিতে পড়ে রয়েছে স্থির হয়ে। আর গোরার ওপর সবাই মিলে নিষ্ঠুরের মত অস্ত্রাঘাত করে চলেছে। তার বাঁ হাত আগেই দেহ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এবারে হল ডান হাত। সে মাটিতে পড়ে গেল। তার মাথাটা পড়ল তিনজন নিহত শত্রুর দেহের ওপর। তার দেহের নীচে এবং আশে পাশেও শত্রুদের শবদেহ।

তখন বাকী শত্রুরা হৈ চৈ করে সুলতানের দিকে ছুটে এল পদ্মিনীর রূপ দেখতে। অনেকে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে যায়। ওদিকে পেছনের আঙিনায় জহরব্রতের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ধূম উদ্গীরণ সুরু করেছে। বড় বড় গাছের কাণ্ড আগুনের তেজে সশব্দে ফেটে চৌচির হচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠেছিল কলাবতী, —ওগো আমি যাচ্ছি। একটু দাঁড়াও।

সে ছুটে গিয়েছিল পেছনের দিকে। আগুনের প্রচণ্ড তাপ গায়ে এসে লাগছিল। সে নীচের দিকে ঝাঁপ দিয়েছিল আগুনের মধ্যে। আর তখনই ঘুম ভেঙে যায়।

গোরা ঘুমে অচেতন। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে তার বুকের ওঠানামা খুবই নিয়মিত। কিন্তু কলাবতীর বুক অশান্ত। দুই কান গরম হয়ে উঠেছে। সে বন্ধ বাতায়ন খুলে দিতেই ঝোড়ো হাওয়া তার চোখে মুখে এসে লাগে।

বাইরে ঝড় উঠেছে। ঘূর্ণী ঝড়। সেই ঝড় শুক্লপক্ষের চাঁদনী রাতকে ধূসর করে তুলেছে। বাতায়ন বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে হয় না। সে হাওয়া চায়—মুক্ত হাওয়া।

ঝড়ের শব্দে গোরার ঘুম ভেঙে যায়, পাশে হাত বাড়িয়ে দেখে কলাবতী নেই। নিমেষে শয্যাছেড়ে ওঠে। আস্তে ডাকে কলাবতীর নাম ধরে। কলাবতী সেই ডাক শুনতে পায় না। তার কানে বাইরের দুরন্ত বাতাসের ঝাপটা লাগছিল তখন।

গোরা তাকে দেখতে পায়। কাছে এসে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে আলগোছে হাত রাখে। কলাবতী চমকে ওঠে।

—ঘুম আসছে না বুঝি?

—হ্যাঁ, কেমন ঝড় উঠেছে দেখেছ?

—হুঁ। সুলতানের শিবির তছনছ হবে।

—তুমি ঘুমোও গিয়ে। সকাল হতে না হতে ছুটতে হবে।

—তুমিও চল। ওটা বন্ধ করে দাও।

কলাবতী স্বামীর সঙ্গে এসে শয্যায় শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। মনে মনে ঈশ্বরকে বলে—ওর কিছু হলে আমি যেন ওকে অনুসরণে ব্যর্থ না হই ভগবান।

গোরা কি অনুমান করতে পারে স্ত্রীর মনের অবস্থা? সে টুকরো টুকরো কথায় আদরে সোহাগে কিছুক্ষণের মধ্যেই কলাবতীকে সহজ করে দেয়। তারপর একসময় তারা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

পদ্মিনীর নারীবাহিনী গঠনের প্রস্তাব রাণা নাকচ করে দেয়। তবে এককথায় উড়িয়ে দিতে পারেনি। বেশ কিছু দিন ভাবতে হয়েছে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে। রাণা বলেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে আত্মঘাতিনী হওয়া মুখের কথা নয়। সেই সুযোগ পাওয়া যায় না সব সময়। তার আগেই ধরা পড়ে যেতে পারে।

মহারাণার কথার ওপর কথা বলতে মেবারে মাত্র একজনই রয়েছে। ভীমসিং। কিন্তু এক্ষেত্রে সে পদ্মিনীর অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করল। কারণ রাণার মতের সঙ্গে তার মতের হুবহু মিল রয়েছে। শত্রু সেনার সম্মুখে অসি হাতে পদ্মিনী? পাগল নাকি?

অভিমানী পদ্মিনীর চোখ ফেটে জল এসে যায়। সে একটিও কথা না বলে

চলে যায় প্রাসাদ-শীর্ষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। এখান থেকে চিতোরের আশে পাশে সবদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলা যায়! সেই ভাবেই এটি প্রস্তুত।

তখন মধ্যাহ্ন। দূরের ছোট বড় পাহাড়গুলো আবহমানকাল নির্বাক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের নির্বিকারত্ব দেখলে মনেও হয় না মানবশ্রেণীকে বিশেষ কোন প্রাধান্য দেয় ওরা। তার চেয়ে বরং বন্য পশুপাখীর গুরুত্ব অনেক বেশী ওদের কাছে। কারণ তারা অনেক কাছের প্রাণী। মানুষের শৌর্যবীর্য, মানুষের দেশপ্রেম, তাদের জিঘাংসা প্রেম প্রীতি ইত্যাদির মূল্য কতটুকু ওদের কাছে? দেখলে তো মনে হয় কানাকড়িও নয়। ওদের অনুভূতি আছে কি? হয়ত আছে। নইলে অগস্ত্যের আদেশে বিন্ধ্যপর্বত মাথা নত করেছিল কেন? গৌরী দেবী নিজেই তো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি হিমালয়-দুহিতা। অনুভূতি আছে বৈকি ওদের। কিন্তু সেই অনুভূতি মানবিক বৃত্তি অথবা তাদের ক্রিয়া কলাপ দ্বারা প্রভাবিত নয়।

পদ্মিনীর মনে হয়, ওরা যেন বলছে, আমরা রয়েছি সবার জন্য। আমাদের কোনরকম পক্ষপাতিত্ব নেই। তোমরা যদি আমাদের কাজে লাগিয়ে সুবিধা করে নিতে পার তো নাও। মানা করছি না। বাধাও দিচ্ছি না। তাই বলে আমরা মেবারে আছি বলে তোমাদের অধীন, একথা ভেবে বসো না। আমরা সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তার অধীন। তোমাদের আমরা ঝগড়া বিবাদ করতে বলিনি। মিলে মিশে সুখে বসবাস করতে বলেছি। আমাদের যখন জন্ম, তখন কোথায় ছিলে তোমরা? তার কতশত কোটি বছর পরে তোমাদের অস্তিত্ব বুঝতে পারলাম আমাদের গুহায়। আশ্রয় দিয়েছিলাম। তাড়িয়ে দিই নি। আমরা রাণাও বুঝি না সুলতানও বুঝি না, আমরা রয়েছি মানুষের কল্যানে।

পাহাড়গুলোর সামনের বায়ুমণ্ডল কম্পমান। হয়ত পাহাড় উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বাতাসে জলীয় বাষ্প জমেছে। তাই এমন হচ্ছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নীচের প্রান্তরের দিকে তাকায় পদ্মিনী। ওই সব সারি সারি শিবিরের একটিতে রয়েছে দিল্লীর সুলতান। সে তাকে চায়। রূপকে ভোগ করার লালসা। এই রূপ। মাদকতা আছে নিশ্চয়। নইলে চাইবে কেন?

লোকটা মানুষ কিনা জানা নেই। হয়ত মানুষই। কিন্তু দম্ভ আর ঐশ্বর্য ওর মনুষ্যত্বকে ছেয়ে ফেলেছে। লোকটা একেবারে পশু হয়ত নয়। কারণ পশুদের রূপের চাহিদা থাকে না।

সহসা সুলতানের শিবির শ্রেণীতে একটা আলোড়ন ওঠে। ছোটাছুটি শুরু

হয়ে যায়। পরিখার ভেতর থেকে কিছু লোক ওপরে ওঠে আসে। তবে কি ওদের ওপর কোন আক্রমণ চালানো হয়েছে? কি করে হবে? রাণী এবং তার স্বামী উভয়েই এখন রাজপ্রাসাদে।

পেছনে ভীমসিং-এর কণ্ঠস্বর—পদ্মিনী।

পদ্মিনী ভুলে গিয়েছিল সে অভিমান করেছে। স্বামীর ডাকে মনে পড়ে যায়। কোন জবাব না দিয়ে গবাক্ষের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভীমসিং পেছন থেকে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে—আমার ওপর এই কয়দিন আর রাগ করো না। আমাদের কার পরমায়ু কদিন কেউ জানে না।

অভিমান চোখের জলে ভেসে যায়। স্বামীর বুকে মুখ রেখে আকুল হয়ে কাঁদে সে।

একটু পরে শান্ত হয়ে বলে—দেখতো ওদের শিবিরে চাঞ্চল্য কিসের? আমাদের কেউ তো আক্রমণ করেনি। তবে ওরা অত বিচলিত কিসে?

ভীমসিং গভীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—কিছু বড় বড় পাথরের চাঁই পরিখার ভেতরে গড়িয়ে দেবার কথা ছিল। তাই দিল কি? যাই, দেখিগে।

ভীমসিং তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। পদ্মিনীও ধীরে ধীরে নামতে থাকে।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করার মুখে কলাবতী অপেক্ষা করছিল।

—এই সময়ে তুমি মা কলাবতী? কি ব্যাপার?

কোন ভূমিকা না করেই কলাবতী সোজা প্রশ্ন করে—সুলতান যদি প্রাসাদ আক্রমণ করে আপনি কি করবেন?

পদ্মিনী এই অদ্ভুত প্রশ্নে অবাক হয়। কিন্তু কলাবতী রীতিমত গম্ভীর। সুতরাং লঘুভাবে কথাটা নিতে পারে না।

—সুলতান প্রাসাদের সামনে পৌঁছোবার আগে মেবারের সব কয়টি বীরকে হত্যা করতে হবে।

—আচমকা আক্রমণে অনেক সময় পাশ কাটিয়ে আসা যায়। আমি সে কথা বলছি না। ধরুন সুলতান প্রাসাদ আক্রমণ করে আপনার কক্ষে ঢুকে পড়ল। আপনি একা সেখানে। সুলতান আপনার হাত চেপে ধরল। কি করবেন তখন?

পদ্মিনীর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে। ওড়নার প্রান্তে বাঁধা একটি

ক্ষুদ্র কৌটো দেখিয়ে বলে,—আমার হাত যখন ধরবে তখন এই হাতের রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই এই কৌটো সংগ্রহ করে রেখেছি।

—ধরুন, ওই বিষে কাজ হল না।

—কাজ হবেই। পরীক্ষা করে নিয়েছি। একটি পাখী মরেছে।

—পাখী আর মানুষের প্রাণ সমান নয়। মানুষের প্রাণ সহজে বার হয় না। মানুষের মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের প্রাণ বার হওয়া অনেক বেশী কঠিন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে পদ্মিনী বলে—তুমি কি বলতে চাইছ মা?

—ধরুন, সুলতান আপনার হাত চেপে ধরার সুযোগ পেল। কি করবেন।

পদ্মিনী কঠোর স্বরে বলে—সেই সুযোগ কখনই পাবে না।

—আমি কিন্তু জানি আপনি কি করবেন।

ঋজু ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে পদ্মিনী বলে—কি করব?

—আপনি অসহায়ের মত আর্তনাদ করবেন। আর কিছুই করার থাকবে না।

পদ্মিনী স্তম্ভিত হয়ে কলাবতীর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটির বয়স বেশী নয়। তার আচরণ ও কথাবার্তা খুবই নম্র। সম্পর্কে গুরুস্থানীয় হলেও সম্মানের দিক থেকে তার তুলনায় নগণ্য। তাই এভাবে অপমান করার সাহস খুব স্বাভাবিক নয়। কেন? মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেনি তো?

রূঢ় স্বরে পদ্মিনী বলে—তুমি আমার পদমর্যাদা ভুলে যাচ্ছ।

—ভুলিনি রাণী। কিন্তু নারী হয়ে নারীর দুর্বলতার কথা না জানার হেতু নেই। কাল রাতে আমি এই ধরনের স্বপ্নই দেখেছিলাম। তারপর আপনার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে অন্য কিছু করার কথা ভেবে পাচ্ছি না।

—কি স্বপ্ন দেখেছিলে।

কলাবতী সব বলে।

পদ্মিনী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বলে—তুমি ভুল দেখেছ। এ স্বপ্ন সম্পূর্ণ অলীক। পদ্মিনীকে চিনতে পারোনি। সে বড় সাংঘাতিক। নিজের নারীত্ব সতীত্ব আর ধর্ম রক্ষার জন্যে সে বিষধরের মত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তুমি জেনে রাখো তেমন যদি হয়, সুলতান প্রাসাদে এসে যদি আমার হাত ধরে টানতে থাকে তাহলে আমি আর্তনাদ করব না। বাধাও দেব না। শান্তশিষ্ট রমণীর মত তার সঙ্গে যাব। তারপর প্রথম

সুযোগেই হত্যা করব তাকে। আমাকে ভোগ করার অবকাশ পাবে না সে। কারণ তুটি মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার মত ব্যবস্থা সব সময়ই আমার সঙ্গে থাকে। আজ বলে কথা নয়। আমার এই রূপ আজকের নয়। আমার ছুরিকার আঘাত ব্যর্থ হয় না। ছেলেবেলায় শিখেছি।

কলাবতী আকাশের দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে বলে—আমার স্বপ্ন মিথ্যেই যেন হয়।

পদ্মিনী তার চিবুকে হাত রেখে বলে—কেন? সবটা মিথ্যে হবে কেন মা? তোমার স্বামীর যে অংশটুকু দেখেছ, কী সুন্দর! আমাদের কাকার ওই শৌর্য যে মহা গর্বের। আর তার সহধর্মিনী? কী অপূর্ব তোমার ভূমিকা। তেমন দিন যদি আসে ত ওটুকু সত্যি হতে ক্ষতি কি?

কলাবতী বলে—না ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বপ্ন কি আধ্যেক সত্যি হয়? আপনার ওই আর্তনাদ শোনার পর আমার মন যে খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—ভয় নেই মা। আমার সম্মান আমি রাখব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মন খারাপ করো না।

চৈত্রের শেষ। প্রতি বছর এই দিনটি কামদেবের পুজোর জন্য নির্দিষ্ট থাকে। শোভাযাত্রা বার হয়। পুষ্পধনু আর মীন-লাঞ্ছিত পতাকা হল কামদেবের বৈশিষ্ট্য।

আবহাওয়ায় উত্তাপের আভাষ। বসন্তের শেষ আমেজটুকু মিলিয়ে যেতে থাকে। তপ্ত হাওয়া বইতে সুরু করে। তার প্রভাবে এতদিনের সজীব সতেজ ফুলের মাথা ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে। তবে কয়েক রকমের নতুন ফুল ফুটতে সুরু করে। তারা হল চামেলী আর চাঁপা। রমণীরা সেই ফুলের মালা গাঁথে। খোঁপায় সেই মালা জড়িয়ে দেয়। পুষ্পের অলঙ্কার তৈরী করে বাহুতে বাঁধে, গলায় পরে কামদেবের পুজোর দিনে।

কিন্তু এবারে সবই অন্যরকম। কামদেবের আরাধনা যেন বিগত দিনের স্মৃতি মাত্র। পথে ঘাটে কোন শোভাযাত্রা নেই। উৎসব নেই। তবু গাছে গাছে চামেলী ফুটেছে, চাঁপা ফুটেছে। তাদের সৌরভ সবাই পায়। মন আরও খারাপ হয়ে যায়।

প্রতিদিনের মত ভোর হতেই জগতসিং তার কুটিরের দিকে রওনা হয়। লীলাবাঈকে টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে দিয়ে আবার ফিরে আসবে।

একজন বলে ওঠে—আজকের দিনে শুধু হাতে চললে ?

—কেন ? কি নিয়ে যাব ?

—বাড়ী যাচ্ছ তো ?

—হ্যাঁ।

—ফুল নিয়ে যাও। আজ যে মদনদেবের পুজোর দিন। শুধু হাতে যেতে নেই। তাছাড়া এখানকার মত এত চাঁপা গাছ চিতোরে আর কোথাও পাবে না। দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি।

জগতসিং ভাবে, এটাও একটা নিয়ম। ভালই হল। নইলে লীলা হয়ত দুঃখ পেত।

পথে আনন্দ উৎসব না দেখলেও অনেকের হাতেই ফুল দেখে। মেয়েদের মালা গাঁথতে দেখে। কেউ কেউ ফুল দিয়ে নিজেকে সাজিয়েছে। দেখে জগত খুশী হয়। তার হাতের ফুলের দিকে অনেকের লোলুপ দৃষ্টি চোখে পড়েছে তার।

বাড়ী ফিরে দেখে লীলাবাঈ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে জগতসিংএর। লীলা নিশ্চয় ফুল দেখে খুশী হয়েছে। ভাবছে, স্বামী হিসাবে লোকটা অন্তত কর্তব্যপরায়ণ। সব দিকে লক্ষ্য রয়েছে।

ফুলগুলো দাওয়ার ওপর সযত্নে নামিয়ে রাখে সে।

লীলা সেই দিকে তীর্যক দৃষ্টি হেনে ভেতরে চলে যায়। একটু পরে সে এসে জগতকে খেতে দেয়। জগত চুপচাপ খেয়ে নেয়। লীলা তার সঙ্গে এমনিতে কথা বলে না। তবে তার মধ্যে কোনরকম আড়ষ্টতা নেই। নিপুণ হাতে গৃহস্থলীর সব কাজকর্ম করে। ধনীর দৌহিত্রী বলে কোনরকম গর্ব নেই। কখনো জগতসিংএর অবস্থা নিয়ে একটি মন্তব্যও করেনি। মুখে বিরক্তি বা বিদ্রূপ ফুটে ওঠেনি।

খাওয়া শেষ করে জগত একপাশে বসে একটু বিশ্রাম নেয়। সে ঘরে ঢোকে না কখনো। সঙ্কোচ হয়। না ঢুকে, এখন মনে হয় এ বাড়ীটা যেন তার নয়। সে লীলার ভৃত্য। তাছাড়া ভেতরে ঢুকলে লীলা সহজভাবে নেবে বলে মনে হয় না। অথচ একবার শুয়ে গড়িয়ে নিতে কতই না সাধ হয়। কতদিন শয্যায় শোয়নি।

সে বসে বসে দেখে সজীব ফুলগুলো সূর্যের আলোয় ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ হয়ে গেল ফুলগুলো ছুঁয়েও দেখল না লীলা। সে বোধহয় ভেবেছে, অন্য কোন কারণে এগুলো আনা হয়েছে। এসেই বলা উচিত ছিল লীলাকে। তার তো আত্মসম্মান বোধ রয়েছে। ফুল কোন গৃহস্থলীর

জিনিস নয়। সংসার আর ফুল এক নয়। তাহলে বউ আর ভালবাসাও এক হয়ে যেত।

সে ডাকে,—লীলা।

লীলা সামনে এসে দাঁড়ায়।

—ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে।

—কি হবে? কে আনতে বলল?

—সবাই তো বলল। আজ নাকি তোমরা মালা গাঁথ- খোঁপায় পরো? মদন দেবের পুজোর দিনে নাকি পরতে হয়?

—হ্যাঁ, পরে বটে সবাই। কিন্তু আমি কেন? আমার কি হবে?

—তা তো জানি না। এটাই নাকি নিয়ম? ওরা তো তাই বলে দিল।

লীলা শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে বলে—ওগুলো ফেলে দাও। এ জন্মে আমার আর এ সবের প্রয়োজন নেই। মদনদেবের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে এ-জন্মের মত।

—ও।

এতক্ষণে জগতসিংএর মাথায় ঢোকে ভুল করেবসে আছে সে। লীলাবাঈএর জীবনে সাধ-আহ্লাদ বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তাড়াতাড়ি সহজ হবার জন্য বলে—আজকে কিছু এনে দিতে হবে নাকি?

—না। সব আছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে জগত বলে—আমি চলি তাহলে। কাল সকালে আবার আসব। বিকেলে আসতে পারব না। চাপ পড়েছে।

—ফুলগুলো নিয়ে যাও।

—কি করব?

—পথে ছিটিয়ে দাও। যা খুশী কর।

—এক কাজ করলে হয় না? ওগুলো বরং দেবতাকে উৎসর্গ কর। আমি এনেছি বলে কোন দোষ হবে না। ফুল সব সময়ই নিষ্পাপ। উৎসর্গ করে মনে মনে কামনা কর, পরের জন্মে যাতে খুশী মনে ফুলের অলঙ্কারে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে পার। মদনদেব তোমার অভীপ্সা পরের জন্মে নিশ্চয় পূর্ণ করবেন।

জগতসিং মাথা নীচু করে বাড়ী থেকে বার হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, না-বুঝে ফুলগুলো আনা উচিত হয়নি। এবার থেকে লোকের কথা শুনে কিছু করবে না।

শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানকেই মেবারের মহারাণার কাছে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হল। দিনের পর দিন চিতোরকে ঘিরে রেখেও এতটুকু খাদ্যাভাব ঘটানো গেল না। সুলতান বিস্মিত হয়। এদের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। অথচ রাণার সৈন্যদল তাদের খাদ্য সরবরাহে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করছে। লুঠপাটও করছে অহরহ। এভাবে অনির্দিষ্টকাল বসে থাকা যায় না। দিল্লী অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আলাউদ্দিন ভাল করে জানে, সে নিজে রাজধানীতে উপস্থিত না থাকলে সেখানে সবাই গা ছেড়ে দেয়। একটি মাত্র পথ রয়েছে মরিয়া হয়ে ঠেলে ওপর দিকে ওঠা। কিন্তু তাতে বিস্তর লোকক্ষয় হবে। তাছাড়া জয়-পরাজয়ের কথাও সঠিকভাবে বলা যায় না।

তাই অনেক ভেবে চিন্তে রাণার কাছে দূত প্রেরণ করা হল। দূতের বক্তব্য—অযথা রক্তক্ষয়ের বাসনা সুলতানের নেই। যে অনুপমা রূপসীর কথা শুনে তিনি এতদূর ছুটে এসেছেন তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছাও তাঁর অন্তর্হিত হয়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এটি তিনি করে ফেলেছেন উদ্ভট খেয়ালের বশে। সহস্র সহস্র মানুষকে এই খেয়ালের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া যায় না। তবু এতদূর তিনি এসেছেন। এতদিন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অপেক্ষা করেছেন। তাই একেবারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে মন চায় না। দিল্লীর মানুষেরাই বা ভাববে কি? সুলতান হিসাবে তাঁর সম্মান ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে। মেবারের মহারাণা মহানুভব। তাঁর বংশের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা সারা পৃথিবীর মানুষ জানে। তিনি অনুগ্রহ করলে সুলতান একবার অন্তত সেই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ীকে স্বচক্ষে দর্শন করে নিজের জীবনকে ধন্য করে বিদায় নিতে পারেন।

দূতের বিনয়ী ব্যবহার আর সুমিষ্ট কথায় রাজসভার সবাই খুবই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু সুলতানের প্রস্তাবটি বড় জটিল। এই প্রস্তাবের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং দূতকে একবেলার জন্যে চিতোরে রাখার ব্যবস্থা হল।

রাজসভা থেকে দূত নিষ্ক্রান্ত হতেই রাণা বলে ওঠে,—এই প্রস্তাবের মধ্যে লোকক্ষয় থেকে মেবারকে বাঁচানোর পথ রয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের প্রধান হিসাবে আমাকে ভালভাবে বিচার বিবেচনা করতে হবে।

ভীমসিংহ গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। সে বলে ওঠে,—তাই বলে, তুমি কি বলতে চাও পদ্মিনীকে গিয়ে হাজির হতে হবে ওই কামনা-জর্জরিত মানুষটির সামনে?

—আমি এখনি কোন মন্তব্য করতে চাই না। সেই জন্যে সময় নিয়েছি। সবার পরামর্শ নিয়েই সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

বাদল এককোণায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে রাজসভায় সর্বকনিষ্ঠ। কোন ব্যাপারে মন্তব্য করতে চায় না সাধারণত। কিন্তু আজ বলে ওঠে—আমার মনে হয় যাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছে তাঁর মতামত একবার জেনে নিলে ভাল হত।

গোরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—না। সিদ্ধান্ত যা নেবার এখানেই নিতে হবে। এটি তাঁর ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রশ্ন নয়।

বাদল বলে,—রাজসভার সিদ্ধান্ত তিনি মানতে অস্বীকার করলে? কারণ স্থলতানের সামনে হাজির হওয়া কিংবা না হওয়া তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

গোরা বলে,—যদি আমরা বুঝি সেটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তখন অন্য উপায় ভাবতে হবে।

মহারাণা বলে—ঠিক বলেছ গোরা। স্থলতানের প্রস্তাব আমাদের মনে যেন কোন রকম দুর্বলতার সৃষ্টি না করে। যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার হাতছানি এতে রয়েছে। সেই হাতছানিকে মরীচিকা বলে ভেবে নিয়েই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। স্থলতান সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। তিনি হয়ত প্রলোভনের টোপ ফেলেছেন। মেবার আগে কখনো এই ধরনের প্রলোভনে ভোলেনি।

ভীমসিং বলে—বিরাট প্রলোভন। আমি এখন থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, পদ্মিনীর বিন্দুমাত্র অসম্মানের প্রশ্ন জড়িত থাকলে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

রাণার চোখের সামনে একজনের মুখ ভেসে ওঠে। সেই মানুষটির বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, দূরদর্শিতাও ছিল অসামান্য। সে রাজসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে কয়েকদিন আগে প্রাণত্যাগ করেছে। মানুষটি হল বাবারামসিং। এই রকমের জটিল মুহূর্তে সে অদ্ভুত পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু তার কথা ভেবে লাভ নেই। সভায় বসে রয়েছে খড়্গ সিং, যোধ সিং, বিষ্ণু সিং প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারাও মূর্খ নয়। কিন্তু যে ভাবে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রয়েছে তারা, তাতে মনে হয় না কোন সমাধানের সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। কোন মন্তব্য শোনা যায় না কারও কাছ থেকে। সমস্ত সভাগৃহটি যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

বাদল কিছুক্ষণ উসখুস্ করে। অবশেষে বলে—আমি আবার একই প্রস্তাব রাখছি। তিনিই সব চেয়ে ভাল বুঝবেন, কিসে তাঁর সম্মান থাকবে আর কিসে যাবে। নিজের কথা ভেবে দেশকে ভুলে যাবার মত হীনতা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় না।

প্রবীণেরা একসঙ্গে গুণ্‌গুণ করে ওঠে,—তা মন্দ বলেনি বাদল। আমরা তো কিছুই কূলকিনারা পাচ্ছি না। এ সব ব্যাপারে মেয়েদের বুদ্ধি অনেক সময় ভাল খোলে। রাণীমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখতে দোষ কি? শেষ সিদ্ধান্ত তো মহারাণাই নেবেন।

রাণাও কথাটা মনে মনে মেনে নেয়। সে বলে,—আপনারা সবাই তাহলে রাজী আছেন?

ভীমসিং বলে,—কিন্তু সে যদি দেশের কথা ভেবে অসম্মানজনক কোন কিছুতে রাজী হয়, আমরা মেনে নেব?

মহারাণা কথায় একটু কাঠিন্য মিশিয়ে বলে—তাহলে বুঝব সারা দেশের স্বার্থে নিজেকে বিসর্জন দিতে চাইছেন।

ভীমসিংহ চেঁচিয়ে ওঠে—তাই বলে সতীত্ব—নারীত্ব—

রাণা স্থিরকণ্ঠে বলে—উনি তাতে রাজী হবেন—একথা আপনি ভাবছেন কি করে?

রাণা বাদলকে ইঙ্গিত করতেই সে অন্দরের দিকে ছোটে।

স্তব্ধ সভা অপেক্ষা করতে থাকে। নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে থাকে দুএকজন। উপায় অন্বেষণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আলাউদ্দিন চমৎকার একখানা চাল চেলেছে বটে। রাজা রাণী হাতি ঘোড়া সবার ওপর কিস্তি দিয়ে বসে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাদল ফিরে আসে। সবাই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বাদলের হাবভাবে হতাশাব্যঞ্জক কিছু প্রকাশ পায় না।

ভীমসিংহ উত্তেজনায় আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। বাদলকে সোজা প্রশ্ন করে—কি বলল পদ্মিনী? রাজী?

বাদল বলে,—তিনি একটি সুন্দর উপায় স্থির করেছেন।

—কী সেই উপায়? সে সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? মুখের ওড়না তুলে ধরবে?

রাণার মুখে এবারে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে বলে,—ওকে আগে শেষ করতে দিন। অত উতলা হচ্ছেন কেন?

—হ্যাঁ। তবে এখানে একটু অন্য ভাবে। ওদের মহানুভবতাই হল ওদের সব চাইতে বড় দুর্বলতা। সেই মহানুভবতার সুযোগ নিয়েছি। তাতেই চাপ সৃষ্টি হয়েছে ওদের মনে। ওই মহানুভবতায় আরও সুড়সুড়ি দিয়ে যাব। ফলে ওরা আরও বেশী মাত্রায় মহানুভব হয়ে উঠবে। তাতেই ওদের পতন ঘটবে। তোমরা দেখে নিও।

মুখে কারও কোন রকম ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না। আলাউদ্দিন সেটা লক্ষ্য করে হেসে বলে,—কাল আমার সঙ্গে চিতোরে যাবে মনসুর, আলতাফ আর নজর।

আলতাফ বলে ওঠে—সর্বনাশ।

—ভয় পাচ্ছ? আমি নিজে যাচ্ছি সেকথা ভুলে গেলে? আমি না তোমাদের সুলতান? আমার প্রাণের চেয়ে তোমার প্রাণের দাম বেশী?

আলতাফ বলে,—সেকথা নয় জনাব। আপনার জীবনই আমার জীবন। আপনি না থাকলে, আমাদের কোন মূল্যই নেই। কিন্তু তবু ভয় পাচ্ছি। আমরা সামনা সামনি লড়তে অভ্যস্ত। আমরা সাদামাটা মানুষ। ওসব মহানুভবতা-টবতার খবর যে রাখি না।

—সুযোগ যখন পেয়েছ, বোঝবার চেষ্টা করবে। আর একটা কথা। দুর্গের ঠিক নীচেই পাহাড়ের ঢালু অংশে কোন গোপন জায়গায় আজ রাতের অন্ধকারে পঞ্চাশ জন সিপাহীকে আত্মগোপন করে থাকবার ব্যবস্থা কর। তাদের দলপতি হবে খলিল। আমি যখন গড় থেকে ফিরব, আমার কথামত সে কাজ করবে। একটা ছোট খাটো লড়াই হলেও হতে পারে। তবে না হবার সম্ভাবনাই বেশী।

ওরা সত্যিই বুঝতে পারে না সুলতানের মতলব। ওদের মন দমে রয়েছে। কাল ভোর হলেই সুলতানের সঙ্গে শত্রুর পুরীতে প্রবেশ করতে হবে। দিল্লীর সুলতান আর তার শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের রাজপুতরা হাতের মুঠোর মধ্যে পাবে। হত্যা কিংবা বন্দী করলেই সমগ্র বাহিনীর পরাজয়। সুলতান কি যে করতে চলেছেন খোদা জানেন।

অন্ধকারের মধ্যে গোরা প্রাসাদ শীর্ষের ছাদের ওপর কলাবতীকে কাঁধে নিয়ে বন্‌বন্ করে ঘুরপাক খেতে থাকে। তার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু সেই আনন্দের চোট সামলাতে কলাবতী অস্থির। তার মাথা ঘুরতে সুরু করেছে। অথচ চেঁচিয়ে বলার উপায় নেই, কারণ আশেপাশের উঁচু নীচু

আরও ছোট ছোট ছাদের যে কোন একটিতে পদ্মিনী থাকতে পারেন। স্বয়ং মহারাণাও থাকতে পারেন তাঁর নির্দিষ্ট ছাদে।

অবশেষে গোরা থামে। কলাবতীকে দুহাতে সামনে এনে তার মুখের দিকে অন্ধকারের মধ্যেই চেয়ে দেখে। কলাবতী চোখ বন্ধ করে অচেতন হবার ভান করে।

—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

কলাবতী কথা বলে না।

—মাথা ঘুরছে? একটু বেশী ঘুরিয়ে ফেলেছি।

কলাবতী নির্বাক।

—কথা বলছ না কেন? কথা বল।

কলাবতী তবু নীরব।

গোরা কলাবতীকে ছাদের একপাশে শুইয়ে দেয়! তারপর অস্থিরভাবে ডাকতে থাকে,—কলাবতী, কলাবতী? কথা বল।

কথা বলে না কলাবতী।

গোরা তখন তাকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নীচে নামার জন্যে অগ্রসর হয়।

—থাক অনেক হয়েছে।

—ও, তুমি ইচ্ছে করে চুপ করে ছিলে। কী সাংঘাতিক।

—ও ভাবে ঘুরতে হয়?

—কি হয় ঘুরলে?

—কি আবার হবে? কিছুই হয় না।

—তবে? আমার আনন্দ হলে ঘুরব না?

—তাই বলে আমাকে নিয়ে?

—বাঃ, আমার একা একা আনন্দ হয় নাকি?

কলাবতী হেসে ফেলে।

গোরা বলে,—আসছে কাল সারা মেবারের স্মরণীয় দিবস। স্বয়ং সুলতান আসছেন চিতোরের এই প্রাসাদে। বিজয়ীর মত নয়। বিনয়ের সঙ্গে।

—তোমার আনন্দ হচ্ছে?

—আনন্দ হচ্ছে এই কথা ভেবে যে এত আয়োজন করে দিল্লী থেকে ছুটে এসে এতদিন ধরে অবরোধ করে থেকে শেষে বাধ্য হয়ে সুলতানের আপোষ আমাদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছে।

—কিন্তু পদ্মিনী দেবীকে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করাটা ?

—তিনি তো সামনে উপস্থিত হচ্ছেন না ?

—একই কথা। তাঁর রক্ত মাংসের চেহারা তো দেখতে পাবে সুলতান।

—সে তো তাঁরই প্রস্তাব।

—হ্যাঁ। মেবারকে বাঁচাতে।

—এক কাজ কর। তাঁর বদলে তুমি গিয়ে দাঁড়াও।

—কি বললে ?

—কিছুই বলিনি তো ?

—আর একবার মুখ ফুটে বল ?

—বাঃ, পদ্মিনী দেবী আর তোমার মধ্যে তফাৎ কোথায় ? মেবারের যে কোন রমণী হলেই হল।

—সে কথা জানি।

—তাই বলছিলাম, তুমি যাও। তোমার রূপ দেখে সুলতান কি বলে শুনতে চাই।

কলাবতী তার বেণী দিয়ে গোরাকে আঘাত করতে থাকে আর গোরা ছাদময় ছুটে ছুটে 'উঃ আঃ' করে বেড়ায়।

কলাবতী তাকে ছাড়ে না। তাড়া করতে করতে বলে,—তুমি অপদার্থ। তুমি স্ত্রীর সম্মান রাখতে জান না।

অবশেষে গোরা নতজানু হয়ে কলাবতীর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে,—উঃ আমার অন্যায় হয়েছে। জ্বলে যাচ্ছে। বেণীতো নয়—সাপ। ছোবল মারছে।

—অত সহজে ক্ষমা মেলে না।

—এই যে পা ধরছি !

—আঃ ছাড়ো। কি হচ্ছে—

—ক্ষমা কর।

—না।

—কর।

—না।

—আমার অন্যায় হয়েছে। মুখ ফসকে বার হয়েছে। আর কখনো হবে না। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই ভুল কখনো হবে না। ক্ষমা কর।

—না।

—তবে আমি চেঁচাচ্ছি।

—কেউ শুনতে পাবে না। কেউ নেই।

—নেই? তবে দেখো। এসো।

গোরা কলাবতীকে পাশের ছাদটির কোণে দেখায়। সেখানে একটি মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কলাবতী ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—কে?

—ভাল করে দেখো।

মূর্তিটির মুখ দিয়ে যন্ত্রণাকাতর অব্যক্ত শব্দ বার হয়। দূর থেকেও শোনা যায়। কলাবতী বিস্মিত হয়ে বলে ওঠে,—পদ্মিনী।

—হ্যাঁ। সবার মধ্যে থেকেও তিনি একা। তাঁর কোন সঙ্গী নেই।

—কেন, তাঁর স্বামী? ভীমসিং?

—হয়ত এ ব্যাপারে তাঁর স্বামী তাঁর মনের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারছেন না। মানুষ নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়। অথচ ভগবান তাকে নিঃসঙ্গ করেই পাঠান। তাই না এত মন দেওয়া-নেওয়া। তবু এক এক সময় মানুষ কেমন একা হয়ে যায়। আমরা সেখানে অসহায়।

—হ্যাঁ। তাই। কিন্তু কেন এমন হলো?

—বিধাতার ইচ্ছা।

—কিন্তু আজ ওঁর কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই। সুলতান একবার তাঁর রূপ আরশীর মধ্যে দেখেই তো বিদায় নেবে।

—এইটুকুতেই পদ্মিনী নিজেকে বোধ হয় অপরাধী বলে ভাবছেন। কারণ তিনি জানেন, তাঁর স্বামীর এতে সায় ছিল না।

—চল আমরা নীচে চলে যাই।

—তাই চল।

সারা চিতোর জেনে গিয়েছে কথাটা। সুলতান আলাউদ্দিন প্রাসাদে প্রবেশ করেছে। সসৈন্যে নয়—একাকী বিনীত ভাবে। তার তিন সেনানায়ক অতিথি শালায় বিশ্রাম নিচ্ছে।

জগতসিংএর কানে কথাটা এসে পৌঁছোতে বেশ দেরি হয়ে গেল। সে রয়েছে গোপন জায়গায়। খবরটা শুনেই সে লাফিয়ে ওঠে। অন্য সবাই বিস্মিত হয়ে তার দিকে চাইল।

একজন বলে,—কি হল? যুদ্ধ থামার লক্ষণ দেখেই ঘর মুখো নাকি? ওদের ফিরে যেতে দাও।

জগত তার ঘোড়ায় চেপে বসে চেঁচিয়ে বলে—যুদ্ধ থামতে অনেক দেরি। তোমরা খুব সতর্ক থেকো। আমি একটু পরেই আসছি।

সোজা রাজপ্রাসাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। সুলতানকে বন্দী করতে হবে। তাহলে শত্রুবাহিনীর পরাজয় অবধারিত। অসাধারণ চতুর এই সুলতান। তার চতুরতার গভীরতা মাপার মত ব্যক্তি চিতোরে রয়েছে কিনা কে জানে। উল্টে বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে সুরু করেছে বোধ হয়। এই সুযোগ নিয়েই সুলতান সর্বনাশ ঘটাবে। নইলে অসম্ভব রকমের ঝুঁকি কখনই নিত না।

প্রাসাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতেই ভাগ্যক্রমে বাদলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

জগতসিং ঘোড়া থেকে নেমে বাদলের দিকে ছুটে যায়। তাকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আসতে দেখে বাদল হেসে বলে—এবারে তোমরা ঘরে ফিরতে পারবে।

জগত কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—ওরা হতোদ্যম হলেও একবার আক্রমণ করতে পারে। শেষ চেষ্টা।

—তার মানে ?

—বন্দী সুলতানকে মুক্ত করার চেষ্টা।

ভ্রূকুঞ্চিত করে বাদল বলে,—তুমি কি বলতে চাইছ জগত ?

—সুলতান শুনলাম প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন ?

—হ্যাঁ। তিনি প্রাসাদে আছেন।

—তাঁকে বন্দী করা হয়নি ?

বাদল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারপর কোনরকমে বলে—তুমি কি রসিকতা করার জন্যে এতদূর এসেছ ?

—না। রসিকতা জিনিসটি আমার ধাতে নেই। আমার সোজা প্রশ্ন, সুলতান আর তাঁর সহচরদের বন্দী করা হয়েছে কিনা।

—না। ভুলে যেও না এটা দিল্লী নয়। তাঁরা আমাদের সম্মানিত অতিথি। বন্দী করার প্রশ্ন কোনমতেই ওঠে না। এ মনোভাব ত্যাগ কর জগতসিং। নইলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না।

জগত দৃঢ় কণ্ঠে বলে—যদি এখনো বন্দী করা না হয়ে থাকে, তবে এখুনি তার ব্যবস্থা করুন। নইলে—

—নইলে ?

—মরণের জন্যে প্রস্তুত হন।

পরিবর্তে অভাবনীয় আচরণ পেল সে বাদলের কাছ থেকে। বাদল লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে—মুখ সামলে কথা বল জগতসিং। তোমার প্রতি প্রাসাদের অনুগ্রহ তোমার স্পর্ধাকে আকাশ-ছোঁয়া করে তুলেছে।

জগত কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না বাদল একথা বলছে। তারপর অনেক কষ্টে সে বলে,—ক্ষমা করবেন। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার জায়গায়।

—হ্যাঁ, তাই যাও। আর ভবিষ্যতে না বলে এভাবে কখনো প্রাসাদের কাছে এসো না।

—রাজপুত হিসাবে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি ভেবে মার্জনা করবেন।

—তুমি হীন! জঘন্য মনের পরিচয় দিয়েছ।

জগত ভাবে, বাদল কে? সে মহারাণাও নয়। সুতরাং তার কথায় মান-অপমানের প্রশ্ন মনের মধ্যে তুলে কি লাভ? দেশই এখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। তাতে তার মৃত্যু হয় তো হোক। এসেছে যখন, শেষটুকু বলেই যাবে।

সে কঠিন হয়ে বলে,—আর একটু জঘন্য মনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি। আমার অনুরোধ, নিজে বুদ্ধি না খাটিয়ে মহারাণার কানে কথাটা পৌঁছে দেবেন।

বাদল জগতসিং এর এই ঔদ্ধত্যে জ্বলে উঠে তার অসি কোষ মুক্ত করে।

হাত তুলে জগত বলে—দাঁড়ান। মহারাণাকে বলবেন, সুলতান অনুরোধ করলেও তাঁরা কেউ যেন সুলতানের সঙ্গে প্রাচীরের বাইরে না যান। সাধারণ কিছু সৈন্য সঙ্গে দিতে বলবেন।

মাটিতে পা ঠুকে বাদল বলে,—তুমি দূর হও।

বিষন্ন জগতসিং ধীরে ধীরে গিয়ে ঘোড়ায় চাপে। নিজের জায়গায় গিয়ে মন-মরা হয়ে বসে থাকে। সঙ্গীদের প্রশ্নের কোন উত্তরই সে দেয় না। সে ভালভাবে জানে, সবাই তার বিপক্ষে যাবে। এদের কত গুণ। কিন্তু বিশেষ একটি ক্ষেত্রে এরা বাস্তববুদ্ধি রহিত।

অনেক পরে সে বাড়ির দিকে চলতে সুরু করে। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। আলাউদ্দিনের ব্যাপারটা শুনে সকালে যাওয়া হয়নি। লীলা তাকে সহ্য করতে না পারলেও দায়িত্ব এড়ানো যায় না। সম্পূর্ণ একা থাকে লীলা, তার ভাই শক্তি এসে কাছে থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু শক্তি এ-বাড়ীতে আসতে চায় না বড় একটা।

কিছুদিন আগে বাবারামের মৃত্যু হয়েছে। লীলাবাঈ ভেঙে পড়েছিল। জগত তাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে বলেছিল, যত দিন খুশী থাকতে পারে। কিন্তু পরের দিন বাড়িতে ফিরেই লীলাকে দেখতে পায়। এ-ও বোধ হয় রাজপুতদের কর্তব্যবোধের নিদর্শন। এসব জিনিস দিল্লীওয়ালা জগতের মগজে ঢোকে না।

বাড়ীর দিকে চলতে চলতে দিল্লীর স্থলতানের কথা ভাবে সে। বাদল তাকে ভুল বুঝল। কিন্তু এভাবে দূর করে দিল কেন? তাকে চিনেও তার আত্মমর্যাদায় ঘা দিতে পারল? এত সহজে কি করে মানুষকে অসম্মান করে? বাদল তো জানে, এই আক্রমণকে কেন্দ্র করেই তার জীবনের গতি পালটেছে। সে অতি সাধারণ একজন মানুষ হলেও, তার মতামতকে কিছুটা গুরুত্ব দিতে দোষ কি ছিল? রাণাকে অন্তত বলতে পারত। বাদল তো মহারাণা নয়। দেশের মঙ্গল অমঙ্গলের দায়িত্ব তার ওপর নয়। সে অন্তত রাণার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারত।

বাড়ির বাইরে থেকে লীলাবাঈএর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বেশ হাসি খুশী মনে হচ্ছে। কার সঙ্গে অত জোরে কথা বলছে? লীলারও জীবনে তাহলে আনন্দ আছে। সে একেবারে জীবন্মৃত নয়। আলোচনার ধারা জগতের কানে যায়। আলাউদ্দিনকে নিয়ে পাশের বাড়ীর বধূর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। দিল্লীর স্থলতানের নতি স্বীকার নিয়ে ওদের মন্তব্য শুনতে ভালই লাগছিল।

জগতসিং ভাবে, লীলাবাঈএর এই আনন্দ মুহূর্তটুকুতে ছেদ টেনে কাজ নেই। সে প্রাঙ্গণে প্রবেশ না করে আবার রাস্তা ধরে চলতে স্থরু করে। লীলার হাসি জীবনে সে প্রথম শুনল। বেশ মিষ্টিই তো লাগল শুনতে। পথে-ঘাটে সবার মুখই হাসিতে উজ্জল। অথচ জগতসিং হাসতে পারে না। এই রাজধানীতে সে একা ছন্নছাড়া। সে আশু এক বিপদের আশঙ্কায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে আবার বাড়ির দিকে ফেরে সে। কাল সারারাত একটুও ঘুমোতে পারেনি। রাতে অনেক খাদ্য সামগ্রী এসেছে চোরা-পথে। সতর্ক প্রহরা দিতে হয়েছিল।

বাড়িতে ঢুকতেই লীলা দেখতে পায় তাকে। ওর আলোচনা শেষ হয়ে গেলেও মুখে হাসি লেগে ছিল তখনো। জগতকে দেখে সেই হাসি দপ্‌ করে নিভে গেল। তাড়াতাড়ি আহারের ব্যবস্থা করতে ঘরের ভেতরে চলে যায় সে। জীবনে এটিই তার একমাত্র কর্তব্য।

দাওয়ার ওপর ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসে ভাবে জগত, সে যেন ঠিক একটি পথের কুকুর। তার ওপর সহানুভূতি রয়েছে এ-বাড়ির কর্ত্রীর। না না, সহানুভূতি নয়—কর্তব্য বোধ। তাই আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু খাবার ধরে দেয় সামনে। কারণ জানে, খাবার খেয়েই কুকুর আবার বার হয়ে যাবে। খাবার দিতে দেরি হলে কুকুরটি প্রত্যাশায় অপেক্ষা করবে।

কিন্তু আজ খাবার আসার আগেই জগতসিং ঘুমিয়ে পড়ে। লীলাবাঈ খাবার দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কি করবে ভেবে পায় না। যে ভাবে ঘুমোচ্ছে মানুষটা, তাড়াতাড়ি জাগবে বলে মনে হয় না। অনেক ভেবে ঘুমন্ত জগতের সামনে পাত্রটি ঢাকা দিয়ে রাখে। এক পাত্র জলও রাখে পাশে। তারপর ঘরে গিয়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয়। কান খাড়া থাকে, মানুষটা জাগলেই যাতে খাবার খেয়ে নেয়। তাড়াতাড়ি জাগলে ভাল হত, খেয়ে দেয়ে চলে যেত।

দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যার অনেক আগেই।

সুলতান আলাউদ্দিন মহিষী পদ্মিনীকে আরশীর ভেতরে দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিল। তারপর ভীমসিংকে বলেছিল তার মহাসৌভাগ্যের কথা। বিশ্বের সেরা সুন্দরী ভীমসিংএর অর্ধাঙ্গিনী।

সুলতান এত বেশী বিগলিত হয়ে ভীমসিংএর সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করে যে সে চমৎকৃত হয়ে যায়। তাই সুলতানের একান্ত অনুরোধে তাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনি। চিতোর থেকে সুলতানের শিবিরের দূরত্ব যেটুকু, তার অর্ধেক পথ যখন পার হয়েছে দুজনা, ঠিক তখনই পঞ্চাশজন সিপাহী আচমকা একটি গোপন স্থান থেকে বার হয়ে এসে ভীমসিংকে তুলে নিয়ে শিবিরের দিকে ছোটে। ভীমসিং এর সঙ্গে বেশী কেউ ছিল না। যারা ছিল তারাও কিছু করে উঠতে পারেনি।

মহারাণা বিভ্রান্ত। রাজ্যের গণ্যমাণ্য সবাই বিচলিত। গোরা ক্রুদ্ধ। শুধু বাদল বিবেকের তাড়নায় ছট্‌ফট করতে থাকে। নিজেকে বড় বেশী বুদ্ধিমান ভাবে সে। তারই ফল হাতে-নাতে ফলেছে। যে মানুষটা সুলতানের আক্রমণের কত আগে এসে তাদের সাবধান করে দিল, তার একটা অতি বিচক্ষণ উপদেশকে সে অবহেলা করেছে। তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাদল ভাবে, আজকের এই ঘটনার জন্যে একমাত্র সে-ই দায়ী। প্রাণ দিয়ে হোক, যে ভাবে হোক তাকেই ব্যবস্থা করতে হবে ভীমসিংএর উদ্ধারের। কিন্তু কেমন করে?

প্রাসাদের কক্ষে স্তম্ভিত পদ্মিনী একাকী বসে রয়েছে। তার চোখে জল নেই। সে স্থিরভাবে প্রতিবিধানের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত। সেই সঙ্গে প্রতিশোধ—হ্যাঁ প্রতিশোধ।

ওদিকে জগতসিং খবরটা শুনে বিশেষ বিচলিত হল না। সহজ ভাবেই নিল। সঙ্গীদের উত্তপ্ত আলোচনায় কোনরকম মন্তব্যও করল না। বরং সবাইকে বারবার ডেকে সতর্ক করে দেয়।

সুলতান খবর পাঠিয়েছে একমাত্র পদ্মিনীর বিনিময়ে সে ভীমসিংকে ছাড়তে রাজী। অন্য কোনরকম সর্তে কাজ হবে না। এতো জানা কথাই। তবে জগতসিং দিল্লীর কুটনীতি হাড়ে হাড়ে জানে। সে জানে পদ্মিনীকে সুলতানের কাছে পৌঁছে দিলেও ভীমসিং ছাড়া পাবে না। তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। সে জীবিত রয়েছে জানলে পদ্মিনীর মনে যেটুকু দ্বিধা থাকবে, সুলতান সেই দ্বিধা কখনো রাখতে দেবে না। গোড়াতেই পদ্মিনীর পেছু-টানের মূলোচ্ছেদ করবে। কিছুদিন পদ্মিনী চোখের জলে ভাসবে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে হারেমে। খাওয়া-দাওয়া করতে চাইবে না। তারপরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এক নতুন বেগম-পদ্মিনীর সৃষ্টি হবে। এমন কত হয়েছে সুলতানের জীবনে। এটি পরীক্ষিত সত্য। জেদের বশে অবশ্য দুএকজন আত্মহত্যা করে ফেলেছে। কিন্তু তা হল বিরল ঘটনা। নারী রত্নটি একবার যদি বুঝে ওঠার সময় পায়, এতে তার কুৎসা রটবার কোন সম্ভাবনা নেই, লোকভয়ের বিন্দু মাত্র আশঙ্কা নেই অথবা আশঙ্কা থাকলেও কিছুই এসে যায় না, তখন সে গা-ঝাড়া দিয়ে সজীব হয়ে ওঠে। পদ্মিনীকে হয়ত একটু বেশীদিন সাবধানে চোখে চোখে রাখতে হবে।

জগতসিং বিমর্ষ বোধ করে। নিজের উদ্যমে কিছুই করতে পারবে না সে। যেচে গিয়ে পরামর্শ দেবার কথাও ওঠে না আর। সুতরাং তার জন্যে যেটুকু কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে, সেটুকু ভালভাবে করে যাবে সে। এতদিন পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সরবরাহ ব্যবস্থা চালু থাকা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সুলতানের অতি দক্ষ গুপ্তচরেরাও এ পথের সন্ধান পায় নি এখনো। বিচ্ছিন্নভাবে যে দুচারজন রাতের অন্ধকারে কয়েকবার এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। সুলতান বুঝতে পারেনি, কোথায় কিভাবে তারা মিলিয়ে গেল।

—জগতসিং।

শক্তি ডাকছে তাকে পেছন থেকে—লীলাবাঈ এর ভাই শক্তি সিং।

আশ্চর্য ঘটনা বলতে হবে। সূর্য এখন ডুবুডুবু। এই সময় শক্তি সিং এর অবির্ভাবের কারণ কি ঘটল?

জগত নির্বিকার নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করে।

শক্তি এগিয়ে এসে বেশ কঠোর ভাবে বলে—আপনি আজ খেয়ে আসেননি।

—হ্যাঁ। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেরীতে ঘুম ভাঙলে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। খেয়াল করিনি।

—আপনার পাশেই ঢাকা দেওয়া খাবার পড়েছিল।

—ছিল বটে। আমি ভেবেছিলাম দ্বিতীয় বারের খাবার। এখানে এসে বুঝলাম প্রথমবারের খাবারই ছিল ওটি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

—আপনাকে একবার যেতে হবে।

—বাড়ীতে?

—হ্যাঁ।

—এই অবেলায় আর গিয়ে কি হবে? ছুচারখানা রুটি এদের কাছ থেকে চেয়ে খেয়ে নেব। কাল সকালে যাব আবার।

—এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী আপনি না খেলে লীলাকে অভুক্ত থাকতে হবে। দিল্লীর নিয়ম অবশ্য জানা নেই।

জগত একটু হেসে বলে,—দিল্লীর নিয়ম জান না? আজকের খবর শোনার পরেও বুঝতে পারলে না? দিল্লীর নিয়ম হল যে কোন ভাবে হোক কার্যোদ্ধার করা। তাতে যুদ্ধ প্রতারণা কিংবা যে কোন কৌশল নেওয়া চলতে পারে।

শক্তির মুখ বিকৃত হয়।

জগত বলে—খুব ঘৃণা হল শুনে—তাই না? হবেই তো। তোমরা যে মহানুভব। চল। তোমার বোনকে অভুক্ত রাখার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। এটি অন্তত দিল্লীর কৌশল নয়।

খাবার তৈরীই ছিল। ওরা গিয়ে পৌছোলে লীলাবাঈ খাবার এনে দেয়। জগত হাত ধুয়ে খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একজন ঘোড়সওয়ারের থামার শব্দ হয়। তারপর দ্রুত পদশব্দ। পরমুহূর্তে স্বয়ং বাদলের আবির্ভাব।

লীলাবাঈ বিস্মিত। শক্তিসিং বিহ্বল। বাদলের সঙ্গে জগতের পরিচয়ের কথা তাদের অজানা নয়। বিয়ের দিন বাদল উপস্থিত ছিল। কিন্তু আজকের এই দুর্দিনে প্রাসাদে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে এখানে

ছুটে এল কেন? জগত কোনরকম অন্যায় করেনি তো? কথাটা মনে হতেই লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয় লীলাবাঈএর।

বাদল কাউকে ভ্রূক্ষেপ না করে দৌড়ে এসে জগতসিংএর পাশে বসে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু। তোমাকে আমি অপমানিত করেছি। কত আকুল হয়েই না তুমি ছুটে গিয়েছিলে। তোমার কথা শুনলে আজ এই ঘোর বিপদের মধ্যে পড়তে হত না।

জগতসিং ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তার খাওয়া হয় না। সে বলে, —আমার অপমান নেই। দেশের অপমান শুধু আমার অপমান। তাই আমার বক্তব্যটুকু বলে. তবে এসেছিলাম। আমাকে যখন বন্ধু বলে ডেকেছেন, তখন একটা প্রার্থনাই শুধু রয়েছে আমার।

—প্রার্থনা নয়। তোমার সব কথাতেই আমি রাজী।

—এবারে মরণপণ লড়াই ছাড়া গতি নেই। আমাকে একবার সামনা-সামনি যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। আমার দায়িত্ব পালন করেছি এতদিন। সুলতানের পাঁচ ছয় জন গুপ্তচরের দেহ পাহাড়ের গহ্বরে পড়ে রয়েছে। আমার সঙ্গীরা এখন দক্ষ। আমাকে সামনে নিয়ে চলুন। আমি যুদ্ধ করতে চাই। আমি ভানুলোকে যেতে চাই। শুনেছি ওখানে গেলে আর জন্মাতে হয় না।

—বেশ। কিন্তু এখনি তোমাকে একবার প্রাসাদে যেতে হবে। মহারাণা নিজে ডেকেছেন।

অভুক্ত জগতসিং উঠে পড়ে। তার অশ্ব রয়েছে কর্তব্য স্থলে। বাদল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। আর সে হেঁটে পথ চলতে থাকে।

আলাউদ্দিন লাফিয়ে ওঠে, দুটি হাত সামনে প্রসারিত করে। শিবিরের অন্যান্য সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ে। তারা তাদের সুলতানের চোখ মুখের অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে জয়ের উদগ্র আনন্দ ঝরে পড়তে দেখে।

'জয় তো বটেই। মহা জয়। ঠিক বলেছিল ওদের সুলতান। যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই শুধু জয় হয় না। অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভীমসিং বন্দী হবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল জয় করায়ত্ত। তবু অপেক্ষা করতে হল। দেশটা রাজোয়ারা। এখানকার মানুষদের বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে রাণা বংশের মতিগতি চিরকাল উদ্ভট ধরনের।

কিন্তু অবশেষে দূত এল। এসেই প্রথম কথা—রাণা লক্ষ্মণসিং সুলতানের প্রস্তাবে সম্মত।

আর কিছু শোনার মত ধৈর্য সুলতানের থাকে না। লাফিয়ে উঠে বলে—পদ্মিনী আমার। এই আমার। এবারে তুমি কি বলবে মনসুর?

মনসুর হাসতে হাসতে বলে,—এবারে শুধু আমার পুরস্কারের কথা বলব জাঁহাপনা।

—এ্যাঁ? পুরস্কার? কেন?

—আমিই আপনাকে সেরা রত্নের সন্ধান দিয়েছিলাম।

—তা বটে। ঠিক বলেছ। পুরস্কার দিতে হবে তোমায়। নিশ্চয় দেব। দিল্লী ফিরে গিয়ে পাবে।

সম্মুখে দণ্ডায়মাণ রাণার দূতের অস্তিত্ব ওরা ভুলে যায়। তার সামনে এ-ধরনের আলোচনা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। তাছাড়া দূতের বক্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। সে সবে সুরু করেছিল। ওরা জানে না দূত স্বয়ং মেবারের বীরশ্রেষ্ঠদের অন্যতম—গোরা। সে এদের ভাবগতিক দেখে আর কথাবার্তা শুনে ভেতরে ভেতরে জলে পুড়ে মরছিল। অথচ বাইরে থেকে মুখখানা শান্তশিষ্ট ভদ্রতার মুখোশ আঁটা।

আরও কিছু পরে সুলতান বলে—যাও দূত। আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তোমাদের মহারাণার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি বাস্তববাদী এবং বিবেচক।

—আমার আরও কিছু নিবেদন ছিল।

—আবার কি?

—মহারাণা দু একটি সর্তের কথা বলতে বলে দিয়েছেন।

—সর্ত? হুঁ। ভীমসিংএর অস্তিত্ব ভুলে যাননি তো তোমাদের রাণা?

—আজ্ঞে না। তিনি এ-বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন।

—তবে? আবার সর্ত কেন? যাও।

—রাণা বলেছেন, রাণী পদ্মিনীকে সেইদিনই পাঠানো হবে যেদিন দেখা যাবে আপনি পরিখা থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে সব গুটিয়ে দিল্লী যাবার জন্যে প্রস্তুত।

সুলতানের মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্যে আরক্ত হয়ে ওঠে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—বেশ। কাল থেকেই আমি সব কিছু গুটিয়ে নিচ্ছি। আর কিছু?

—রাণী পদ্মিনীর বিনিময়ে ভীমসিংএর মুক্তি চাই।

—অবশ্যই। এতো আমারই প্রস্তাব। আর কিছু ?

—আমাদের এই মেবারে রাণী পদ্মিনীর সম্মান অসাধারণ। তিনি এখানে একা আসতে পারেন না। তিনি আসবেন তাঁর পরিচারিকা আর সহচরী পরিবৃত হয়ে। এঁদের অনেকে তাঁর সঙ্গে দিল্লী যাবে। অন্য সবাই এখানে তাঁকে শেষ বিদায় জানিয়ে চিতোরে ফিরে যাবে।

কথাটা শুনে মনসুর এবং আরও অনেকের চোখ মুখ জ্বল্‌জ্বল্ করে ওঠে। তারা সুলতান এবং দূতের অলক্ষ্যে পরস্পরের গা টেপাটেপি করে। পদ্মিনী সুন্দরী শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যারা তাকে বিদায় জানাতে আসবে তারাও নিশ্চয় কুৎসিত হবে না। সেই সব সুন্দরীদের মধ্যে থেকে কিছু বেছে নিয়ে যেতে পারলে তাদের ক্ষুদ্র হারেমও ভরপুর হয়ে উঠবে।

ওরা চায় সুলতান এখনি সম্মতি জানিয়ে দিক। কিন্তু চাইলেই তো হল না, সব নির্ভর করছে তার মর্জির ওপর।

শেষে মনসুরকেই সুলতান প্রশ্ন করে বসেন—তোমাদের কি মত মনসুর ? বিদায়ের অশ্রুজল সহ্য করতে পারবে তো ?

কথাটা লুফে নিয়ে মনসুর বলে ওঠে,—আলবাৎ পারব জাঁহাপনা। আহা, ওদের রাণী চিরকালের জন্যে চিতোর ছেড়ে চলে যাবেন। প্রাণ হাহাকার করবে না? খুবই স্বাভাবিক। অশ্রু বিসর্জনের সুযোগ দিতেই হবে। অবশ্য, আমরা সেই দৃশ্য সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। দেখা খুবই কঠিন। আমরা না হয় একটু দূরে সরে থাকব।

মনসুরের বাচালতার পেছনে তার উদ্দেশ্যটি ধরে ফেলে সুলতান হেসে ফেলে। দূতের দিকে ফিরে বলে,—ঠিক আছে। তাই হবে।

গোরা সবই বুঝতে পারে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় ওদের ওপর। কিন্তু সে দূত। দূত অবধ্যও বটে, অক্ষমও বটে।

সে বলে,—রাণী পদ্মিনীর সঙ্গে সাতশো পালকী আর ডুলি আসবে। সেই পালকী আর ডুলিতে আসবে রাণীর সহচরীরা।

মনসুর অতি উৎসাহে সুলতানের মুখ খোলার অপেক্ষা না করেই বলে ওঠে,—ঠিক আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরে যান। মহারাণাকে গিয়ে বলুন সুলতান সানন্দে রাজী হয়েছেন।

গোরা সুলতানের মুখের দিকে চাইতে আলাউদ্দিন ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়। তারপর বলে—তুমি যেতে পার। অনেক সময় নষ্ট করেছি।

তোমার কথা ধৈর্য ধরে শুনেছি। এতে তোমাদের মহারাণাকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়েছে। আর নয়।

গোরা শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

পরদিনই চিতোরের প্রাকার থেকে দেখতে পাওয়া যায় আলাউদ্দিনের সিপাহীদের বিদায়ের প্রস্তুতিপর্ব স্বরু হয়ে গিয়েছে। দলে দলে সবাই পরিখা থেকে উঠে আসছে। উট এবং অশ্বারোহীরা এক জায়গায় গিয়ে জড়ো হয়েছে। পদাতিকরাও নিশ্চিন্তে একজায়গায় রান্নাবান্না করছে। এতদিন অভ্যস্ত খাদ্য তারা বিশেষ পায়নি। ওরা এতটা ঢিলে দিতে পারত না। কিন্তু আসল ঘুঁটিটি রয়েছে ওদেরই কব্জায়। ভীমসিং বন্দী। মহারাণার তরফ থেকে এতটুকু বেচাল কিছু দেখলেই ভীমসিং নিহত হবে।

এদিকে চিতোরেও বিরাট আয়োজন। রাণী পদ্মিনীর সুশোভিত পালকীকে মাঝখানে রেখে সামনে পেছনে সাতশো ডুলি আর পালকী যাবে। প্রত্যেকটিতে থাকবে শ্রেষ্ঠ বীরদের একজন করে। আর পালকীর বাহক হবে সুনিপুণ যোদ্ধারা। উদ্দেশ্য হল, যে মুহূর্তে পদ্মিনী একান্তে ভীমসিংএর কাছে বিদায় চাইতে যাবে, তখনি চিতোরের বীরদের একটা অংশ ব্যূহ রচনা করে ভীমসিং আর পদ্মিনীকে নিয়ে সরে পড়বে। দূরে তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে অশ্ব। অবশিষ্ট সৈন্যেরা সুলতান বাহিনীকে বাধা দিতে দিতে পেছনে সরতে থাকবে। দেহের শেষ রক্তবিন্দু পণ রেখে তারা বাধা দেবে, যাতে পদ্মিনী আর ভীমসিং আবার বন্দী না হয়।

জগতসিং বাদলকে বলে অনেক চেষ্টায় পালকী বাহকদের একজন হতে পেরেছে। এই বারে সে দেশের জন্যে লড়তে পারবে। প্রাণ দেবার সুযোগ মিলবে। কিন্তু লড়তে হবে তাকে সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে—নিজেও একদিন যাদের একজন ছিল। ওদের ওপর তার মায়া রয়েছে। ওদের ভালবাসে সে। ওরাও তারই মত সাধারণ মানুষ। ওদের সংসারের খবর তার অজানা নয়। দুঃখদুর্দশা অর্থকষ্ট সবই রয়েছে ওদের। সুতরাং কোথাও যুদ্ধে জয়ী হলে সুলতানের উৎসাহে ওরা লুঠপাট চালায়। ভাবে, লুঠের সামগ্রী দিয়ে সংসারের অনটন দূর করবে। কিন্তু সবই স্বপ্নের মত বিলীন হয়ে যায়। কতটুকু আর অবশিষ্ট থাকে দেশে ফিরে গেলে? আগেই শেষ হয়ে যায়। দলে মিশে ওরা অনেক সময় মানুষ থাকে না। দেশে ফিরলে খেয়াল হয়। তখন মনের আফসোস মনের মধ্যে চেপে রেখে দগ্ধে দগ্ধে মরে।

ওরা সত্যিই জগতসিংএর আপন জন। দোস্ত ইমতিয়াজ ওদের সঙ্গে এসেছে কিনা কে জানে। যদি আসত, আর যদি দেখা করার সুযোগ মিলত, তাহলে তার বড় আদরের ঘোড়াকে ফিরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এ সম্ভব নয়।

ওদের সঙ্গেই করতে হবে যুদ্ধ। ওদের হত্যা করতে হবে। কারণ তার মাতৃভূমিকে গ্রাস করতে এসেছে ওরা। তার চেয়েও বড় কথা মাতৃভূমির সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে এসেছে। ওরা অতশত বোঝে না। অথচ ওদের দিয়ে কার্যোদ্ধার করবে সুলতান। সুতরাং হত্যা ছাড়া পথ নেই।

গোরা হল আজকের দিনের অধিনায়ক। মহারাণা স্বয়ং তাকে নির্বাচিত করেছে। কলাবতী স্বামীর কপালে ছুঁইয়ে দিয়েছে গৌরীদেবীর সিঁদুর। স্বামীর অসির কোষের মধ্যে ফেলে দিয়েছে পুজোর নির্মাল্য। বাদলের কপালেও সিঁদুরের স্পর্শ। জগতসিং সবার দিকে ফিরে ফিরে দেখে। সবাই জমা হয়েছে দুর্গের ময়দানে। সবার কপালেই বিভিন্ন রকমের ফোঁটা। কারও শ্বেতচন্দন, কারও রক্তচন্দন, কারও কপালে গোরার মত শুধু সিঁদুর, কারও বা অন্য কিছু। কিন্তু তাকে কেউ কিছু দেয়নি। পুজোর নির্মাল্যও সঙ্গে রাখতে বলেনি কেউ। সে জানত না। জানলে চেয়ে নিত দেবীর চরণের পুষ্প। লীলাবাঈকে জগতসিং বলেছিল, আজ সে যুদ্ধে যাবে। বলেছিল, মহারাণার কৌশলের কথা। আপন মনেই বলে গিয়েছিল। সে যে পালকীর বাহক হবে তাও বলেছিল। লীলা কোন মন্তব্য করেনি। বোধ হয়, সাধারণ কথা ভেবে কান দেয়নি। কিংবা বুঝতে পারেনি, আজই জীবনের শেষ দিন হতে পারে। তাকে জিনিসপত্র এনে দেবার জন্যে জগত আর না-ও আসতে পারে কখনো। বুঝলে নিশ্চয় প্রথা অনুযায়ী কিছু করত। এতে সঙ্কোচের কিছু নেই। ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকলেও দেশের কাজে সবাই এক। ব্যক্তিগত শত্রুর জীবনহানি না হলে দেশেরই মঙ্গল।

গোরা ময়দানে বার হয়ে আসে প্রাসাদ থেকে। চিৎকার করে বলে,—তোমরা সব প্রস্তুত হও।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বীরেরা পালকী আর ডুলির ভেতরে প্রবেশ করল। আগে থেকেই ঠিক ছিল জগতসিং হবে বাদলের ডুলির বাহকদের একজন। বাদল প্রবেশ করতেই সে গিয়ে দাঁড়ালো সেখানে।

ওপর থেকে রাণী পদ্মিনী নেমে এলেন। এতটুকুও বিচলিত বলে মনে হল না। ধীর স্থির—অবিচল। পাতলা ওড়নার ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট

মুখের আভাষ পাওয়া যায়। সেই মুখ দৃঢ়—পাষাণের মত। জগত সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এমন একজন রমণীকে সে প্রথম দেখল। তার রূপ কতটুকু রয়েছে লক্ষ্য করা গেল না বটে, কিন্তু তাঁর মন শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনার ধাতু দিয়ে তৈরী। প্রাসাদের প্রতিটি বাতায়ন আর গবাক্ষের ভেতর দিয়ে অনেক রমণীকে চেয়ে থাকতে দেখা গেল। সূর্য কিরণে তাঁদের চোখের জল চিক্‌চিক্‌ করছে। কিন্তু এই নারীর চোখে একটুও জল নেই। জল থাকলে অমন অনায়াস ভঙ্গিতে গোরার সঙ্গে এসে পাল্কীতে উঠতে পারত না।

যাত্রা সুরু হল।

দূর থেকে সারিবদ্ধ পালকী পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে আসতে দেখে মনসুর আর অন্যান্য ওমরাহ সুলতানের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়। তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে থাকে। সুলতানের পদ্মিনী আছে বটে, কিন্তু তাদের বরাতও খুলে যাবে। আহা, ওর মধ্যে বসে রয়েছে সুন্দরী ললনাগণ। প্রত্যেকে নিজের নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে সুপুরুষ তারা! সুন্দরীরা প্রথমে কান্নাকাটি করলেও এই চেহারা আর ঐশ্বর্য দেখে নিশ্চয় ভুলে যাবে চিতোরের কথা। দিল্লী ফেরার পথেই তাদের সাহচর্যে যাত্রাপথ মধুময় হয়ে উঠবে। এক একজনের ভাগে কতজন সুন্দরী পড়বে কে জানে?

ওরা আবার চিৎকার করতেই সুলতান ধমকে ওঠে। সবাই থতমত খেয়ে থেমে যায়। সুলতান আজ বড় বেশী আতর মেখেছে। ওরাও মেখেছে দেখাদেখি। চুপ করে গিয়ে দাড়ি গোঁফে হাত বুলিয়ে নিজের নিজের আতরের বিশেষত্ব পরখ করতে থাকে।

সুলতান বলে,—এ ভাবে চেঁচালে তোমাদের শকট দেওয়া হবে না। এক একজনকে এক একটা উটের পিঠে চাপিয়ে দিল্লী পাঠাবো।

মনসুর প্রায় কেঁদে ফেলে। সে তাড়াতাড়ি সুলতানের সামনে নতজানু হয়ে বলে—আর একবারও চেঁচাবো না হুজুর।

—চুপচাপ অপেক্ষা কর। তোমরা সাধারণ সিপাহী নও। ওরা কি ভাবছে তোমাদের দেখে?

পদ্মিনীর দল আরও কাছে এগিয়ে আসে।

দলটিকে চালনা করে নিয়ে আসছে একজন অশ্বারোহী। সে প্রৌঢ় এবং অপরিচিত।

আলাউদ্দিন মনে মনে হেসে ওঠে। মহারাণা একেবারে বেয়াকুব। নিজে আসেনি সেজন্যে। কিংবা কোন সেনাপতিকেও পাঠায় নি। একা ভীমসিংএর ঠেলা সামলাতে সব মাহাত্ম্য ছুটে গিয়েছে।

একেবারে কাছে এসে প্রৌঢ় অশ্ব থেকে নেমে সুলতানকে অভিবাদন জানায়।

সুলতান বলে ওঠে,—কোথায় পদ্মিনী?

প্রৌঢ় বলে,—তিনি রয়েছেন ওই পালকীতে। কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্যে বড়ই উতলা হয়ে পড়েছেন। আপনি অনুগ্রহ করে সেই ব্যবস্থা আগে করে দিন।

প্রৌঢ় সুলতানের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করে। আজ পদ্মিনীকে সঙ্গে না আনলেও চলত। কিন্তু সুলতান অত্যন্ত চতুর। সে হয়ত প্রথমেই দেখতে চাইবে পদ্মিনী এসেছে কিনা। তাই পদ্মিনীকে আসতে হয়েছে।

কিন্তু সুলতান দেখতে চাইল না। সে হুকুম জারি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা সাক্ষাতের পালা চুকিয়ে ফেলতে চায়।

পথ প্রদর্শকের সঙ্গে প্রৌঢ় পালকী আর ডুলির সারি নিয়ে এগিয়ে যেতেই সুলতান হুংকার দিয়ে ওঠে,—থাম। শুনে যাও তুমি।

প্রৌঢ় বিস্মিত হয়। সুলতানের ব্যবহার হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠল কেন?

কাছে যেতেই সুলতান বলে—শুধু সাক্ষাৎ। বুঝলে? খুব জলদি। একটু দেরি হলেই তোমাদের ভীম সিংকে আর ফিরে যেতে হবে না।

—যে আজ্ঞে।

সে চলে যেতেই সুলতান চোখ টিপে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে একটি ছোট্ট দল এগিয়ে যায়। কারণ ভীম সিংকে ছেড়ে দেবার বাসনা সুলতানের আদৌ নেই। প্রথমে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে জীবিত অবস্থায় রেখে দিলে মেবারের মত বেয়াদব রাজ্যটা বশে থাকবে। আর যদি দেখা যায় তাতেও কাজ হচ্ছে না তখন খতম করে দিলেই হবে।

সুলতানকে মুখ টিপে হাসতে দেখে মনসুরের দল ভরসা পেয়ে কাছে এগিয়ে আসে। তবে তাদের চোখের দৃষ্টি অপস্রিয়মান ডুলিগুলোর দিকে। সেই চোখে কত ক্ষুধা, কত তৃষ্ণা।

সুলতান অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করতে করতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বড্ড বেশী সময় নিচ্ছে ভীম সিং আর পদ্মিনী। যতই সোহাগ ভরে জড়িয়ে

ধরে হাপুস নয়নে কাঁদ না দুজনে—আজই শেষ। এরপর থেকে ওই রত্নটি আমার—একা এই আমার। আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে শোভা পাবে। আমি হলাম দিল্লীর স্থলতান "সেকেন্দার সাহনি"। সেই অতীত যুগের সেকেন্দারের পরে আমার মত বীর জন্মায় নি কেউ।

আলাউদ্দিন সরোষে চেঁচিয়ে ওঠে—যাও উল্লুকের দল। এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ ? এখনি গিয়ে ভীম সিংকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর।

মনস্থররা ছুটতে শুরু করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সহসা যেন ধুলোর ঝড় ওঠে। ভীষণ কোলাহল, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি। স্থলতান কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পায় একটি পালকী ছুটে চলেছে সাঁ সাঁ করে। আর তার পেছনে বর্ম-পরিহিত রাজপুত যোদ্ধারা চলেছে। স্থলতানের অপ্রস্তুত সৈন্যরা তাদের অস্ত্রাঘাতে একের পর এক লুটিয়ে পড়ছে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী আলাউদ্দিন এক নিমেষে সব বুঝে ফেলে। কিন্তু তার সৈন্যবাহিনী ঠিক প্রস্তুত নয়। তবু তার চমকপ্রদ ব্যবস্থাপনায় একদল সৈন্য রাজপুতদের দিকে ধাওয়া করে। প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। দিনের পর দিন পরিখার মধ্যে বসে থেকে যারা এ পর্যন্ত লড়াই-এর স্বাদ লাভে বঞ্চিত ছিল তারা এতদিনে সেই স্বাদ পেয়ে ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু বিপক্ষে যারা রয়েছে তারা মোটেই সাধারণ সৈনিক নয়। তারা মেবারের বাছাই করা যোদ্ধা। তাদের রণকৌশল অনেক উন্নত—তারা মরিয়া। বেতনের লোভে যুদ্ধে রত হয়নি তারা। তাদের রয়েছে আদর্শ আর দেশপ্রেম। তাদের রয়েছে নারীর সম্মান রক্ষার প্রতিজ্ঞা। স্থতরাং স্থলতান বাহিনীকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে পদ্মিনী আর ভীম সিংকে চিতোরে যাবার পথ স্থগম করে দিল তারা।

যুদ্ধ কিন্তু অত সহজে মিটল না। আলাউদ্দিন ক্ষেপে গিয়েছে। চিৎকার করে বারবার বলতে লাগল—খতম করে দাও সবাইকে। একটাকেও ফিরতে দিও না।

রাজপুত যোদ্ধারা ধীরে ধীরে পেছনে হটতে থাকে। তারা চায় কোন-রকমে চিতোরে গিয়ে পৌছোতে। তাদের উদ্দেশ্য আগেই সফল হয়েছে। কিন্তু স্থলতানের সেনারা তা হতে দেবে না কিছুতেই। যুদ্ধ শুরু হল পাহাড়ের ঢালু অংশে—চিতোরে ওঠার পথে।

জগত সিং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে গোরা আর বাদলের শৌর্য। শত্রুদের ব্যূহ বারবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তারা। নিজেকে বড় হীন

মনে হয় ওদের কাছে। তার তরবারি রক্তাক্ত হলেও কতজনকে আর শেষ করে দিতে পেরেছে? তাছাড়া তার অতি সাধারণ পোষাক বোধ হয় শত্রুদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। গোরা আর বাদলের অঙ্গে শোভা পাচ্ছে রাজকীয় পরিচ্ছদ। তাই তাদের দিকে শত্রুর নজর অনেক বেশী।

সেই সময় সহসা তার ওপর আক্রমণ আসে। সে সব কিছু ভুলে গিয়ে অসি চালাতে থাকে। দুজন সিপাহী তার আঘাতে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে। একটু অবসর পেয়ে সে গোরা আর বাদলকে খুঁজে বেড়ায়। দেখতে পায় কিছু দূরে তাদের ঘিরে ধরেছে কম করে জনা পঁচিশ সিপাহী। ওখানে ছুটে যাওয়া সম্ভব নয়। এবারে বোধহয় আর ওদের রক্ষা নেই। অনেক চেষ্টা করেও সে বাদলের কাছাকাছি আসতে পারল না।

পেছনে খস্‌খস্ আওয়াজ। জগত্‌সিং চকিতে ঘুরে দাঁড়ায়। একজন সিপাহী একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। পাথরের ওপর তার পা ফসকে গিয়েছে। নইলে এতক্ষণে জগতের মাথা ছিটকে পড়ে ছুটতে সুরু করত নীচের দিকে। কিন্তু এবারে সিপাহীটি তার আওতায়। তরবারি তুলে আঘাত করতে গিয়েই থমকে যায় জগত। এ-মুখ যে খুবই পরিচিত। চোখের ওই ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে।

সে চেঁচিয়ে বলে—ইমতিয়াজ!

—জগত। তুমি!

—ইমতিয়াজ ভাই। দোস্ত্।

দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় ইমতিয়াজ। সে এবারে নাক কুঁচকে বলে—না। আমি দোস্ত নই। আমি দুশমন।

—না ইমতিয়াজ। কখনই না।

—হ্যাঁ। তুমি নিমকহারাম। তুমি ঘোড়া-চোর।

—আমি নিমকহারাম নই ইমতিয়াজ। আমি মাতৃভূমির জন্যে লড়ছি। দিল্লীর নিমক খেলেও মাতৃভূমির জন্যে নিজেকে সঁপে দেওয়ায় পাপ নেই। তবে অস্বীকার করছি না, তোমার ঘোড়া আমি নিয়ে এসেছি। না এনে উপায় ছিল না। তুমি অপেক্ষা কর এখানে, যদি বেঁচে ফিরে যাই তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

—কোন দরকার নেই। তোমার খরসান্ খুনে লাল হয়ে আছে। তুমি আমার অনেক ভাইএর জীবন নিয়েছ। নিয়ে এখনো বেঁচে আছ। তোমাকে বাঁচতে দিতে পারি না।

—বেশ তো, তুমি অন্যদের পাঠাও আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু তোমার সঙ্গে—

ইমতিয়াজ অবসর না দিয়ে অসি তুলে আক্রমণ করে। ইমতিয়াজের চোখে সে দুর্বলতা দেখেছে—সেই দুর্বলতা তার প্রতি মমতাবোধ। কিন্তু সে আদর্শপ্রাণ। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। একই ওস্তাদের কাছে ওদের অস্ত্র শিক্ষা। ওদের মার প্যাঁচ সবই এক রকমের।

যুদ্ধ চলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। উভয়েই আহত হতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ আর শেষ হয় না। জগত জানে ইমতিয়াজের বাঁ কাঁধে তার তরবারি জোর আঘাত হেনেছে। বেশীক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তেমনি ইমতিয়াজের অসি তার পায়ে বড় রকমের ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। সেই ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে। সেও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইমতিয়াজের আঘাত গুরুতর হলেও, তারটিও সামান্য নয়। রক্তক্ষয়ের ফলে দুজনের কেউ-ই বাঁচবে বলে মনে হয় না। বড় দুঃখ থেকে গেল। শেষ পর্যন্ত বন্ধুকে হত্যা করতে হল? আজ যদি ইমতিয়াজ না হয়ে অন্য কেউ হত, কত আনন্দে মরতে পারত। সে কি ভানুলোকে আশ্রয় পাবে? ভানুদেব কি তাকে বন্ধু হত্যার জন্য তিরস্কৃত করবেন না? তাকে নির্বাসিত করবেন না?

ইমতিয়াজ পড়ে যায়। তাই দেখে জগত সিংও তার পাশে শুয়ে পড়ে! শত্রুকে নাকি বেঁচে থাকতে দিতে নেই। কিন্তু দোস্তকে শেষ আঘাত দেবার কল্পনা সে করতে পারে না। তাছাড়া ততখানি শক্তিও তার অবশিষ্ট ছিল না।

রক্তে ইমতিয়াজের বুক ভেসে যায়। সে অতিকষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকে। জগতের মাথাও ঝিমঝিম করে। তবু সে যতটা পারে ইমতিয়াজের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকে—দোস্ত।

—বল জগত।

—আমরা দুজনাই বোধ হয় বাঁচব না। আমি বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু অনেক খুন বেরিয়ে গিয়েছে।

—আমার মৃত্যুর বিশেষ দেরি নেই। খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি দারুণ লড়েছ জগত। কিন্তু এখনো পায়ের দিকটা বাঁচাতে পারোনা দেখলাম, ওটা শিখে নিও বেঁচে থাকলে।

—দোস্ত আমাকে ক্ষমা কর। চুরির উদ্দেশ্যে তোমার ঘোড়া নিইনি।

আমি জানি দোস্ত। যখনই বলেছ বিশ্বাস করেছি। তুমি মিথ্যা কথা বলতে না কখনো। আমায় তো বলবেই না।

—ইমতিয়াজ তুমি সাদি করেছ ?

—না। ভয় নেই।

—যাক।

—তুমি অত বোকা কেন জগত ? যুদ্ধের সময় ওভাবে থেমে যেতে হয় ?

—তুমিও বোকা। তোমার চোখে অত মমতা মাখানো থাকে কেন ? মুখে বড় বড় কথা, অথচ চোখে ভালবাসা !

যন্ত্রণার মধ্যেও জগত অতীতের টুকরো টুকরো স্মৃতি রোমন্থন করার চেষ্টা করে। ইমতিয়াজ অতিকষ্টে সায় দিয়ে চলে। তার অসীম যন্ত্রণার মধ্যেও মুখে তৃপ্তির হাসি।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ বুক চেপে ধরে দু হাত দিয়ে।

জগত ডেকে ওঠে,—দোস্ত।

ফিস ফিস করে ইমতিয়াজ বলে—এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসতাম।

পরক্ষণেই তার দেহ প্রবল ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। তারপর স্থির হয়ে যায়।

জগত তার একটি হাত বাড়িয়ে বন্ধুকে বেষ্টন করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। তারও চেতনা বিলুপ্ত হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

বীর যোদ্ধাদের অধিকাংশই পড়ে রইল চিতোরের প্রাকারের বাইরে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ফিরে আসছে অতি কষ্টে আহত অবস্থায়।

মহারাণা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে সুলতান আলাউদ্দিনের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল না চিতোরের ওপর। তারা নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ফিরে গেল পরিখার পাশে। সুলতানের কী উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। সম্ভবত আগামীকাল সুগঠিত বাহিনী নিয়ে চিতোরকে ধ্বংস করতে আসবে। এবারে আর ছেড়ে কথা বলবে না। তার হীন কৌশল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারা এলে বাধা দেওয়ার বড় একটা কেউ নেই। সেনাবাহিনীকে কে পরিচালিত করবে ? হয়ত গোরা বেঁচে রয়েছে, হয়ত বাদল বেঁচে রয়েছে কিংবা অন্য এক-আধজন। কিন্তু যুদ্ধ করার মত অক্ষত অবস্থায় রয়েছে কিনা সন্দেহ।

ঠিক সেই সময় একজনকে রাণা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে দেখে শূন্য রাজসভায়। আজ বাতি দেওয়া হয়নি ভালভাবে। চিনতে পারা যায় না।

—কে ?

—আমি বাদল।

বাদল কাছে আসে। তার শরীরে অনেক ক্ষত। রক্ত ঝরছে।

—তুমি বেঁচে আছ তাহলে ?

—হ্যাঁ মহারাণা। আমি বেঁচে রইলাম। কিন্তু কাকা নিহত।

—কে ? কি বললে তুমি ?

—কাকা নিহত মহারাণা।

—গোরা ? নিহত ?

রাণা লক্ষ্মণ সিং স্তব্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থাকে। সে বিশেষ করে গোরার জীবন রক্ষার জন্য চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে মনে মনে কত প্রার্থনাই না করেছিল। দেবী তার প্রার্থনা শুনলেন না। তাঁর অভিপ্রায়ের কথা তিনিই জানেন।

বাদলের উপস্থিতির কথা মহারাণা কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ ভুলে যায়। খেয়াল হলে বলে—কলাবতীকে এই সংবাদ কে শোনাবে বাদল ?

—আমি। আমাকেই শোনাতে হবে। আমি ছাড়া কারও মুখে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি তৃপ্ত হবেন না। বরাবর আমিই ছিলাম পাশে-পাশে। আমাকে যেতে অনুমতি দিন।

—হ্যাঁ যাও।

বাদল চলে যায়। মহারাণা শূন্য সভাগৃহে একা বসে থাকে। ভাবে পদ্মিনীর সম্মান আপাতত বাঁচলেও আজই রাতে জ্বলে উঠবে এক বিরাট চিতা। সেই চিতায় অগ্নি সংযোগের পরে মেবারের নিহত যোদ্ধাদের সহধর্মিনীরা আত্মাহুতি দেবে। সেই দলে থাকবে কলাবতী—তরুণী কলাবতী।

মহারাণার চোখদুটি সজল হয়ে উঠে।

ওদিকে বাদল এগিয়ে চলে অন্দর মহলের দিকে। সে জানে কলাবতী আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। সে কি তার স্বামীকে সশরীরে দেখার জন্য প্রতীক্ষারত ?

কথাটা মনে হতে বাদলের গতি রুদ্ধ হয় ক্ষণেকের জন্যে। যারা তাকে দেখতে পায়, তার শোণিতসিক্ত দেহের দিকে চেয়ে থাকে তারা। কেউ কাছে এসে কোন প্রশ্ন করে না। বোধহয় বুঝে ফেলেছে। নইলে এই অবস্থায় সে কলাবতীর কক্ষের দিকে এগিয়ে যাবে কেন ?

নিজের মনকে শক্ত করে নিয়ে বাদল কক্ষে প্রবেশ করে। কলাবতী এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে তাকে দেখতে পেয়ে। ধীরে ধীরে তার আপাদ-

মস্তক কয়েকবার দেখে নিয়ে খুব নিম্নস্বরে বলে—বাদল। তুমি ফিরে এসেছ ?

—হ্যাঁ কাকীমা।

—তবে—তবে তিনি কি আসবেন না আর ? ভানুলোকের দিকে যাত্রা করেছেন ?

বাদল চেষ্টা করেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

—বল বাদল। আমি জানি। নইলে তিনি নিজেই তো আসতেন।

—কাকীমা।

—বাদল। তুমি দেখছি এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ। দ্বিধা কেন ? এতে দুঃখই বা কিসের ? সঙ্কোচ কিসের ? এ যে মেবার। এখানে তো দুঃখের ছায়াপাত ঘটে না। সূর্যবংশ এখানে রাজত্ব করে। সূর্যের নীচে কি কখনো ছায়া নামে বাদল ? বল। আমাকে শোনাও, আমার স্বামী কেমন করে শত্রু বধ করলেন।

—তাঁর কথা মুখে বলার মত শক্তি আমার নেই কাকীমা। যে জিনিস কল্পনাকেও ছাপিয়ে যায় তা কি কখনো ভাষায় বলা যায় ? আপনি সেই অসম সাহসী বীরের অসি চালনা স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারতেন না। সে যে কী দৃশ্য ভাবতেও রোমাঞ্চ জাগে সারা দেহে।

—কতজন শত্রু নিধন করলেন তিনি বাদল ?

—গুনে শেষ করা যায় না। অসংখ্য। মনে হল স্বয়ং ভৈরব বুঝি রাণার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে যুদ্ধে নেমেছেন। মানুষের শক্তি তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ।

—বল বাদল, আরও বল। শত্রুরা তাই দেখে কি বলল ?

—কি আর বলব কাকীমা, তাঁর সুখ্যাতি করার মত একজনও অবশিষ্ট রইল না। একজনও যদি বেঁচে থাকত সারা জীবন শুধু এই কথাই বলত। কিন্তু কেউ রইল না।

কলাবতীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তীব্র উত্তেজনা নিয়ে সে আবার বলে,—থেমে যেওনা বাদল। বল। আরও বল।

—তাঁর মাথার নীচে রয়েছে তিনজন শত্রুর মৃতদেহ। তাঁর দেহ ঘিরে শোভা পাচ্ছে কম করে পঁচিশজন শত্রুর শব। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একজন রাজপুতের জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন যা হয়ে থাকে, ঠিক তাই দেখে আমি ধন্য হয়েছি। এর চেয়ে বড় রকমের উচ্চাশা আর থাকতে পারে না। ওঁর

কাছে বারবার আমি প্রার্থনা করে চলেছি ওঁর অর্ধেক বীরত্বও যেন আমি দেখাতে পারি শেষ দিনে।

—আঃ বাদল। কী তৃপ্তি যে পেলাম। সুখে থাক। দীর্ঘায়ু হও। আমি চলি। উনি আবার অধৈর্য হয়ে পড়বেন আমার দেরি দেখে। অভিমানে কথাই বলতে চাইবেন না হয়ত। একা রয়েছেন।

কলাবতী ধেয়ে চলে যেখানে জহরব্রতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জীবনে শেষবারের মত কাকীমার পদধূলি নেবারও সুযোগ পেল না বাদল। সে মেঝেতে অবসন্ন অবস্থায় বসে পড়ে। তারপর অতি কষ্টে কাকীমা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠেকায়। অস্ফুট স্বরে বলে—কাকীমা, কে বড়? তুমি? না সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী?

কৃষ্ণপক্ষের রজনী। চিতোরের পথ ঘাট আজ অন্ধকার। কারও গৃহে বাতি জ্বলতে দেখা যায় না। শুধু দূরে বিরাট চিতার আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়নি বলে ওপরের আকাশে রক্তিম আভা।

চিতোরের বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কিছু প্রদীপ জোনাকীর আলোর মত ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন হয়। যুদ্ধ যদি রাজধানীর কাছাকাছি হয়, তবে এমন দেখা যায়। যাদের প্রিয়জন ঘরে ফেরেনি, তারা খুঁজে দেখছে। কারও মুখে খবর পায়নি এরা। সব খবর পাওয়া সম্ভব নয়। তাই নিজেরাই খুঁজে দেখছে। কেউ কেউ মৃত আত্মীয়কে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। নিহত আর কিছু কিছু আহত সৈনিকের স্তূপের মধ্যে থেকে এরা নিজেদের প্রিয়জনকে বেছে নিচ্ছে। খুঁজে দেখছে কারও পিতা, কারও পুত্র কারও বা অন্য আত্মীয়স্বজন। সবাই কিন্তু আহতদের একপাশে এনে শুইয়ে দিচ্ছে। এদের নিয়ে যেতেই হবে। এখানে আত্মীয় অনাত্মীয় ভেদাভেদ নেই।

এই দলে একজন তরুণীও রয়েছে। সে প্রতিটি মৃতদেহের মুখের সামনে প্রদীপ ধরে দেখছে আর মাথা ঝাঁকিয়ে সরে সরে যাচ্ছে নিরাশ হয়ে। এই ভাবে খুঁজতে খুঁজতে কত রাত হয়ে গেল তবু পায় না আসল মানুষটিকে।

তবে কি শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে? ফিরে যাবার জন্যে তো আসেনি, না পেলে এই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে নীচে। কিন্তু তার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাবে স্ত্রীর মর্যাদা দাবী না

করলেও পরের জন্মে যেন ওঁর দাসী হয়ে সেবা করে কৃতার্থ হয়। তাহলে তারও পরের জন্মে আবার স্বামী হিসাবে পেতে পারে।

তরুণী প্রদীপ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি মৃতের পাশে এসে থমকে দাঁড়ায়। খুব পরিচিত ওই দেহ—ঋজু, সবল। মুখের কাছে প্রদীপ ধরেই ডুকরে কেঁদে ওঠে।

নিজের কোলের ওপর সযত্নে মাথা তুলে নিয়ে অশ্রুপাত করতে করতে বলে—শুনছো, আমি লীলা। তোমার কাছে এসেছি। আমি পাপীয়সী। আমাকে তুমি শাস্তি দাও। আমার দম্ভ ভেঙে গিয়েছে। আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। আমি লীলা গো।

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু জগত সিং-এর মাথার ওপর ঝরে পড়তে থাকে।

লীলাবতী পাগলিনীর মত জগতের গালের ওপর গাল রাখে, তার ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখে।

—জগত। আমার জগত। কথা বলবে না? একবার শুধু বল। একবার আমার নাম ধরে ডাকো। কখনো তো ডাকোনি।

বুকে অসহ্য জ্বালা লীলার। মুখে কথা আসে না। কী কথা বলবে? বলার যে কিছুই নেই। অথচ কতই না রয়েছে বলার। নইলে এত যন্ত্রণা কেন? সে জগতের অসি নিজের হাতে তুলে নেয়। এই ভাল। ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে এই অসি দিয়ে সে নিজের দেহ নিজের হাতে খণ্ডায়িত করবে। তাতে কিছুটা জ্বালা কমবে। তারপর শেষে সে এই তীক্ষ্ণ দিকটা কণ্ঠে রেখে চেপে দেবে।

কৃত-সঙ্কল্প হয়ে সে জগতের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথা রেখেই চমকে ওঠে। স্পন্দন যেন। দেহ তো একেবারে শীতল নয়। আবার বুকে কান পাতে। হ্যাঁ। খুব ক্ষীণ একটা স্পন্দন।

তাড়াতাড়ি সে জগতের মাথা পাথরের উপর সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে ওঠে—ওগো। তোমরা কে আছ? শিগগির এসো। আমার জগত বেঁচে আছে।

দুতিনটি প্রদীপ এগিয়ে আসতে থাকে লীলাবাঈ-এর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে।

—এইদিকে। দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি এসো না গো। আমার জগত বেঁচে আছে।

অন্ধকারে কক্ষের মধ্যে বসে রয়েছে একাকিনী পদ্মিনী। অনুশোচনায়

দগ্ধ হতে থাকে সে। ঈশ্বর বিশ্বের সবটুকু সৌন্দর্য ঢেলে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাকে। কিন্তু সুখ ভোগের জন্যে নয়। সুখের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এবারে দুঃখ—শুধু দুঃখ। সারা মেবারের হাহাকার এখন তারই বুকে। কেউ কি বুঝবে একথা? কেউ বুঝবে না।

আজকের এই ঘটনা তার আর তার স্বামীর মধ্যে তুলে দিয়েছে দুস্তর ব্যবধানের প্রাচীর। সুলতানের শিবির থেকে ফিরে আসা অবধি ভীম সিং দূরের একটি প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করে রয়েছে। বাইরে থেকে মহারাণার ডাকেও সাড়া দেয়নি। আত্মগ্লানি—নিদারুণ আত্মগ্লানিতে জর্জরিত সে। দেশবাসীর কাছে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে সূর্যবংশের কলঙ্ক সে—ভীরু কাপুরুষ। নইলে মেবারের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পত্নীর সঙ্গে পালিয়ে আসতে পারত না। পত্নীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজে যুদ্ধরত দলটির অধিনায়ক হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু তা পারেনি। স্বার্থপরতা। ঘোর স্বার্থপরতা। আত্মসুখ ছাড়া একে আর কিছুই বলা যায় না। দেশের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে পদ্মিনীর কথা ভেবেছে। দেশের চেয়ে পদ্মিনী হয়ে উঠেছে বড়। রাণী পদ্মিনীর সম্মান নয়—নিজের মোহ আর ভোগবিলাসই প্রাধান্য পেয়েছে তার কাছে। অথচ আজ তার মৃত্যু হলে কত গৌরবের হত।

পদ্মিনী সবই বুঝতে পারে। কারণ সেও তার স্বামীকে কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করেনি। ধিক তাকে। মুখ ফুটে কেউ না বললেও একথা কি ঠিক নয় যে তারা উভয়েই আজ ঘৃণার পাত্র? ইতিহাসে এই কথাই কলঙ্কের কালিতে লেখা থাকবে। ভবিষ্যতে সবাই জানবে অসামান্য রূপ লাবণ্যের সুযোগ নিয়ে বিবাহ-সূত্রে এক রমণী রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করে সমস্ত দেশকে অতলান্ত দুর্গতির গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। সেই নারী দেশের জন্যে আত্ম-বিসর্জন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ সহজতম সুযোগটি তারই ছিল। বীরাঙ্গনা রমণীর মত সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বুকে ছুরিকা বসিয়ে আত্মহত্যা করলে নিজের সঙ্গে দেশের সম্মানও অনায়াসে অটুট রাখতে পারত। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। পারেনি নিজের রূপ বিনষ্ট হবার ভয়ে। পারেনি স্বামীর সোহাগে আকণ্ঠ ডুবে থাকার মোহে।

পদ্মিনীর দুই নয়ন বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরতে থাকে। আহা কলাবতী। ফুলের মত পবিত্র মেয়েটি। শেষ হয়ে গেল সে। আরও কত নারী প্রাণ দিয়েছে তারই জন্যে।

ঘরের বাইরে পদশব্দ। পদ্মিনী সচকিত হয়ে ওঠে। ভীম সিং নয়—অন্য কেউ। না, একজন নয়। একাধিক লোকের পদশব্দ। সুলতানের সেনারা এলো নাকি? সর্বশেষ ব্যূহও ভেঙে পড়ল? পড়ুক। আর কোন আকর্ষণ নেই। আসুক সুলতানের লোক। এবারে সত্যিই প্রস্তুত সে। ইতিহাস জানবে কিনা জানা নেই, তবে এটুকু সে জানে স্বামীর জীবন রক্ষা করতে নারী যে কোন পথ বেছে নিতে পারে। এ তার সহজাত। এতে কি পাপ হয়?

তবে এবারে সুলতান এলে আর কোনদিকেই চাইবে না সে। এখন সে শুধু মৃত্যু চায়। সে মরণে এই দমবন্ধকরা আবহাওয়া কেটে যাবে। নতুন হাওয়া বইবে। মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

পদ শব্দ দ্রুত। তার স্বামীর ঘরের দিকে কারা গেল যেন। পদ্মিনী জানে, তার স্বামী আত্মহত্যা করে লজ্জার বোঝাকে আর বাড়াবে না।

দ্বার খোলার শব্দ হয়। ভীম সিংএর দ্বার। এত দুঃখের মধ্যেও কৌতূহল জাগে মনে। সে-ও ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় তার কক্ষের বন্ধ কপাটের কাছে। কান পাতে।

পদশব্দ ফিরে আসে। তার কপাটের পাশ দিয়ে চলে যায়। কোমরের ছুরিকা হাতে নেয়। তারপর দ্বার খোলে।

সেই মুহূর্তে ভীম সিং একা সেই স্থান অতিক্রম করছিল। দ্বার খোলার শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে পদ্মিনীকে দেখতে পায়। এক মুহূর্ত। তারপর আবার এগিয়ে যেতেই পদ্মিনী আকুল হয়ে ডাকে—একবারটি শুধু শোনো।

একটু দ্বিধা। ভীম সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনরকমে বলে—দেবী—দেখা দিয়েছেন। মহারাণাকে দেখা দিয়েছেন। রাণা ডাকছেন। আমি যাচ্ছি।

ভীম সিং এর কথা শুনে পদ্মিনী স্তব্ধ হয়ে যায়। এ যেন তার স্বামী নয়, অন্য কেউ। স্বামী তার অনেক দূরের মানুষ। দেখা যায় তবু চেনা যায় না।

ভীম সিং এগিয়ে যেতে গিয়ে থেমে যায়। তারপর কী মনে করে এক পা এক পা করে পদ্মিনীর কাছে এসে বলে—দুঃখ করো না পদ্মিনী। দিন আসছে। আমরা দুজনা প্রমাণ করে দেব, আমরাও দেশের সন্তান। আমরাও মরতে জানি।

—হ্যাঁ, আমরাও মরতে জানি, কিন্তু কি করে?

—লক্ষ্মণ শুনেছে। দেবী বলেছেন নিজের মুখে। তাঁর দারুণ ক্ষুধা।

সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে একমাত্র রাজবংশের রক্তে। একটি নয়, দুটিও নয়, অনেক বংশধরের রক্ত। স্পষ্ট বলেছেন দেবী। তাই বলছি আর ভাবনা নেই। আমিও সূর্যবংশের সন্তান। এবারে আমি মরতে পারব।

—দেবী কখন দেখা দিলেন মহারাণাকে?

—একটু আগে।

—চিতোর তাহলে ধ্বংস হবে? আমরা মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু চিতোর?

—বাঁচবে। চিতোর যে অক্ষয়। সে কি মরতে পারে? রাণা বংশের বারোজনের মৃত্যু হলেই দেবীর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। তাই বলছি আর ভাবনা নেই। এবারে আমি মরতে পারব।

—হ্যাঁ। আমিও। আমিও মরতে চাই। আমি মা কলাবতীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। দেবী আর কি বলেছেন?

—সব কথা শুনিনি এখনো। তাই চলেছি শুনতে। শুধু শুনলাম তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার কক্ষ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম দর্শন দিয়েই বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন—ম্যায় ভুখা হুঁ।

—ম্যায় ভুখা হুঁ?

—হ্যাঁ পদ্মিনী। এখন বুঝেছি যা কিছু ঘটে গেল বা ঘটতে চলেছে তার আসল কারণ দেবীর ক্ষুধা। তোমার রূপ হল গৌণ। তোমার অন্তর্বেদনার কারণ নেই।

ভীম সিং চলে যায়। পদ্মিনী সেদিকে চেয়ে থাকে।

উপসংহার

ইতিহাস বলে, দিল্লীর সুলতান এ যাত্রায় আর চিতোর আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। সে অনুমান করতে পারেনি, ভীম সিং এবং পদ্মিনীকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরেরা আত্মবিসর্জন দিয়ে বসে আছে। দীর্ঘদিন নিষ্ফলা অবরোধের ফলে বাহিনীর মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল অনেক আগে থেকেই। তার উপর ছিল খাদ্যাভাব আর রাজস্থানের আবহাওয়ার রুদ্ররোষ। তাই সুলতান পদ্মিনী লাভে বঞ্চিত হয়ে ব্যর্থতার বোঝা বুকে নিয়ে ফিরে চলল রাজধানী দিল্লীর দিকে।

চিতোর সেদিন উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল কিনা জানা নেই। কারণ ঘরে ঘরে বিচ্ছেদ ক্রন্দনের মধ্যেও সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা আনন্দ প্রকাশের মত ছিল বলে কোথাও লেখা নেই। তবে স্বস্তির নিশ্বাস হয়ত ফেলেছিল তারা। যারা যায় তারা আর ফেরে না। কিন্তু তারা তাদের মৃত্যু বরণকে সার্থক বলে মনে করে শুধু সেই সমস্ত মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবে যারা বেঁচে থাকবে এই পৃথিবীতে। সাময়িক ভাবে হলেও মঙ্গল হয়েছিল বৈকি। আলাউদ্দিনের বাহিনীর উপস্থিতি তাদের মনের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল এতদিন। এবারে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল। তাদের দেশভক্ত বীরেরা আলাউদ্দিনের বলিষ্ঠ স্নায়ুর ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। নইলে এত আয়োজনের পরও একটি ক্ষুদ্ররাজ্যের দ্বারদেশে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে এভাবে ফিরে যেত না কখনই আলাউদ্দিনের মত সুলতান।

কিন্তু আলাউদ্দিন ইতিহাসে মাত্র একজনই আছে। সে অন্য ধাতুতে গড়া। পদ্মিনীকে ভুলতে সে পারেনি কখনো। দিনে রাতে শয়নে স্বপনে আরশীর মাধ্যমে দেখা পদ্মিনীর রূপ তাকে বারবার উতলা করেছে তার যৌবনের অনেক বছর চলে গেল। কিন্তু তরুণ মনের সেই আকাঙ্খা নিবৃত্তি হল না। পদ্মিনীকে চাই—চাই—চাই—।

অবশেষে বারো বছর পরে নতুন উদ্যম নিয়ে আবার অভিযান। একযুগ আগের সুলতানের চেহারায় তারুণ্যের ছাপ হয়ত এখনো একেবারে অন্তর্হিত হয়নি, কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তার চুলে পাক ধরেছে তার ললাটের রেখা আরও গভীর হয়েছে, তার নাসিকার দুপাশে আবছা নতুন রেখার আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু চোখ দুটি যেন আরও তীক্ষ্ণ।

বিরাট বাহিনী সুলতানের। প্রতি পদক্ষেপে দৃঢ়তার আভাষ। এবারে আর অবরোধ নয় সোজা আক্রমণ। এতে মৃতের সংখ্যা অগুণতি হলেও ক্ষতি নেই।

এদিকে চিতোর বলতে গেলে বীরশূন্য। তবু মেবারে নতুন বীরের অভাব ঘটে না কখনো। বীর প্রসবিনী এখানকার ভূমি, এখানকার মাতৃ-জঠর। তবে বীরত্বের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিশ্রণ হতে সময় লাগে।

এবারে রয়েছে দেবীর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ। একজন নয়, দুইজন নয় —পরপর বারোজন রাণার শোনিতে ধরিত্রী আর্দ্র হলে দেবীর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটবে। এর কোন বিকল্প নেই। এই বারোজন রাণার মৃত্যুর জন্যে বারো পুরুষ অপেক্ষা করতে হবে না। কারণ মহারাণা লক্ষ্মণ সিং এর রয়েছে দ্বাদশ পুত্র। তাদের মধ্যে অনেকে এখনো কৈশোর অতিক্রম করেনি বটে, তাতে কিছু এসে যায় না। দেবীর নির্দেশ পালন করতেই হবে। প্রতি পুত্রকে এক একদিন রাণার পদে অভিষিক্ত করা হবে। সে চিতোরের প্রাকারের বাইরে সুলতানের সেনাবাহিনীর মধ্যে সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফিরে আসার জন্যে তার এই যুদ্ধ হবে না। লক্ষ্মণ সিং জানে। দ্বাদশ পুত্রের মৃত্যু ঘটলে সূর্যবংশ নির্বংশ হবে। তাই সে ঠিক করেছে পুত্রদের মধ্যে একজনকে অনুচর সহ রাতের অন্ধকারে সুলতানের ব্যূহের পাশ কাটিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে দূরের পার্বত্য সঙ্কুল কেলওয়ারায়। আর তার জায়গায় লক্ষ্মণ সিং নিজে যুদ্ধ করবে। এক পিতা আর একাদশ পুত্র মিলে দ্বাদশ রাণা।

দ্বিতীয় পুত্র অজিত সিং মহারাণার পুত্রদের মধ্যে প্রিয়। সুতরাং তাকেই অনুরোধ জানানো হল। প্রথমে সে অস্বীকার করলেও, পিতার যুক্তি আর আকূতিতে সাড়া না দিয়ে পারল না। সে চলে গেল চিতোর ছেড়ে দূরে—সূর্য বংশের ধারাকে বজায় রাখতে।

এবারে রাণার আর চিন্তা নেই। পরদিন থেকে সুরু হল যুদ্ধ।

আলাউদ্দিন ভেবেছিল সৈন্য বাহিনী নিয়ে চিতোরের ওপর আছড়ে

পড়লে প্রতিরোধ ক্ষমতা চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো নয়। এ যে এক অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল, একে কি কৌশল বলে? না, অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে আত্মহত্যার অত্যুগ্র বাসনা! এমন কখনো দেখেনি সুলতান—কল্পনাও করেনি।

প্রতিদিন সে লক্ষ্য করে ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে কোনদিন এক কিশোর আসে। কোন দিন বা বার হয়ে আসে নিতান্ত এক তরুণ। কিন্তু কী তাদের তেজ কী ব্যক্তিত্ব। সৈন্য পরিচালনার কী অসাধারণ দক্ষতা। মহারাণা কি পাগল হয়েছে? এইসব বীরদের কেন মৃত্যু ঘটাচ্ছে এমন ভাবে? তাদের সামলাতে এ পক্ষেরও প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। যারা মরিয়া, যারা ফিরবে না প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধে নামে তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দুঃসাধ্য।

সুলতান বিচলিত হয়ে সিপাহসালারকে ডাকে। সে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ায়।

সুলতান বলে—রাণার ছত্র মাথায় নিয়ে এক একদিন এক একজন শিশু বার হয়ে আসে চিতোর থেকে। এরা কারা?

—এখনো জানতে পারিনি জাঁহাপনা। চিতোরে গুপ্তচরের প্রবেশ অসাধ্য ব্যাপার।

—যারা আহত হচ্ছে যুদ্ধে সেই সব রাজপুতদের কাছে জানতে পারো নি?

—আহত কেউ-ই হচ্ছেনা খোদাবন্দ্! সবাই নিহত হচ্ছে।

সুলতানের ধৈর্য চ্যুতি ঘটে। বলে—কেন হচ্ছে? একজনকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করোনি কেন?

—চেষ্টার কসুর করিনি। পারিনি।

—পারোনি? নিজের অক্ষমতার কথা বুক ফুলিয়ে বলতে খুব ভাল-লাগে? বেশ আজ আমি যুদ্ধ করব।

সিপাহসালার মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে যায়।

সেদিন সত্যিই সুলতান যুদ্ধে নামে। তার লক্ষ্য রাজ ছত্র মাথায় তরুণটির প্রতি। কিন্তু কার সাধ্য তার কাছে ঘেঁষে। সে যেন একটি অত্যুজ্জ্বল অগ্নিগোলক। তাকে যে স্পর্শ করবে সে-ই মুহূর্তে দপ্ করে জলে উঠে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আহত অবস্থায় বন্দী করা গেল না। তার অনুচরদেরও নয়। অসি নিয়েও তার নিকট-বর্তী হওয়া বিপদজনক। প্রচুর লোকক্ষয়ের দরুন ভীত হয়ে সুলতান

তাকে বল্লম দিয়ে দূর থেকে আঘাত করে। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে।

সুলতান ছুটে তার কাছে গিয়ে নিজের লোকদের সরিয়ে দেয়। ঝুঁকে পড়ে তার ওপর। প্রাণ তখনো রয়েছে।

—কে তুমি ?

—মহারাণা।

তরুণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

আশাহত সুলতান বিষণ্ণ মনে শিবিরে ফেরে। একাকী পরিশ্রান্ত অবস্থায় ভাবতে ভাবতে একসময়ে তার মনে হয়, বোধহয় প্রতিদিনের সেনাপতিকে একটি করে রাজছত্র দেওয়া হয়। কারণ এই ছত্র সম্পূর্ণ নতুন। প্রতিটি ছত্র মূল্যবান কারুকার্য শোভিত হলেও খুবই ছোট। অথচ প্রতিটিতেই "মেবারের মহারাণা" কথাটি লেখা রয়েছে। এ এক রহস্য।

ভীম সিং পদ্মিনীর কক্ষে প্রবেশ করে। বারো বছরে ভীম সিং-এর চেহারার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আগের চেয়ে সে সামান্য স্থূল। আগের লঘু পদক্ষেপ এখন অনেকটা ভারী। কিন্তু পদ্মিনীর দিকে চাইলে অবাক হতে হয়। একটুকুও পরিবর্তন চোখে পড়ে না। সেই রূপ আজও অটুট। অনন্ত যৌবনা সে।

ভীম সিং বলে—সব ঠিক হয়ে গেল।

—কি সিদ্ধান্তে এলে ?

—লক্ষ্মণ সিং শেষের দিনে যুদ্ধে নামবে। সেইদিন আমিও নামব।

—শেষের দিন বলতে তো আর মাত্র দুইদিন বাকী।

—হ্যাঁ। মাত্র দুইদিন।

—বেশ। শেষের দিন যত তাড়াতাড়ি আসে ততই ভাল। কারণ আমি আর পারছি না। পতি-হারা মেয়েরা আমার কাছে এসে ভীড় করছে। তাদের অভিযোগ স্বামীর সঙ্গে গিয়ে মিলতে পারছে না।

—প্রথম প্রথম প্রতিদিনই তো জহরব্রতের আয়োজন করা হচ্ছিল। কিন্তু তাতে কত অসুবিধা দেখলে তো ? মানুষের অভাব। তাই শেষের দিন পর্যন্ত সব স্থগিত রাখা হয়েছে। কত বড় আয়োজন করা হয়েছে ওদের সবাইকে দেখিয়ে দাও। তাতে সান্ত্বনা পাবে।

—ওরা সব জানে। ওরা অবুঝও নয়। তবু মন কি মানে ?

—বোধহয় মানে না। পদ্মিনী।

পদ্মিনী চমকে ওঠে। এমন ডাক বহুদিন সে শুনতে পায় নি।

—বল।

—পদ্মিনী। একসময় আমার ধারণা ছিল তোমার প্রতি আমার ভালবাসায় তোমার রূপের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এখন বুঝছি, রূপের প্রভাব থাকলেও ততটা নয়। পরজন্মে তোমার রূপ না থাকলেও কিছু এসে যাবে না।

—জানি গো। আমিও সব সময় প্রার্থনা করি আর যেন এই সর্বনাশা রূপ নিয়ে আমাকে জন্মাতে না হয়।

একটু উদাস হয়ে থাকার পর ভীম সিং বলে—সুলতান একটা পত্র দিয়েছে। তোমাকে তার হাতে সমর্পণ করতে বলেছে। নইলে সমস্ত চিতোরকে সে ধ্বংস করবে। আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে ফেলবে।

পদ্মিনী বলে—মানুষটা অস্বাভাবিক। যাহোক চিতোর গড় ভস্মীভূত হলেও নতুন চিতোর গড়ে উঠবে। চিতোর অক্ষয়। সুলতানের হুমকিতে আর আমাদের কিছু এসে যায় না।

—হ্যাঁ! মহারাণাও জবাব দিয়ে দিয়েছেন। চিতোরগড় পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, কিছু এসে যায় না।

সেই সময় বাইরে পদ শব্দ হয়।

বাদল এসে প্রবেশ করে। বলে—আমিও কেন শুধু শুধু শেষের দিনটির জন্য অপেক্ষা করব? আমাকে আজই যেতে অনুমতি দিন।

ভীম সিং বলে,—বেশ তো? তুমি আজই যাও। তবে যাবার আগে লক্ষ্মণকে জানিয়ে যেও। কারণ সে শেষ সংগ্রামের একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছে। তাতে তোমার ভূমিকা আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, তাহলে লক্ষ্মণ তোমাকে আজকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দেবে না।

—আমি এখনি তার কাছে যাচ্ছি।

বাদল নতজানু হয়ে ভীম সিং আর পদ্মিনীর পদধূলি গ্রহণ করে।

উভয়ে তার মাথায় ও বুকে হাত রেখে আশীর্বাদ করে।

পদ্মিনী বলে,—আমরা আবার এইখানেই ফিরে আসব বাদল। তখন কে মহারাণা থাকবে কে জানে। হয়ত অজিত সিং-এর পুত্র কিংবা দৌহিত্র।

ভীম সিং বলে,—বলা মুশকিল।

—কেন?

—শুনেছি লক্ষ্মণ সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি ছেলে রয়েছে। সে তার মাতুলালয়ে রয়েছে মায়ের সঙ্গে। লক্ষ্মণের ইচ্ছে, সে বেঁচে থাকলে মেবারের রাণা সে-ই হবে। কারণ ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী সে।

বাদল বলে,—তাকে কি পাওয়া যাবে?

—সূর্য দেবের অভিপ্রায় হলে সবই সম্ভব।

বাদল পরজন্মের উজ্জ্বল দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে হাসিমুখে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

লক্ষ্মণ সিং-এর পত্র পেয়ে সুলতান আলাউদ্দিনের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই উত্তাপ কিছুতেই যেতে চায় না। রাতে ঘুম হয় না দুদিন। এত স্পর্ধা কোথায় পায় এই লোকটি। তারপর ভাবে, স্পর্ধা তো হবেই। গতবার সে নিষ্ফল হয়ে ফিরে গিয়েছে। এবারেও বলতে গেলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ভেবেছিল, এবারে সোজা এসে চিতোরের দ্বারে ধাক্কা দেবে। ভেঙে ফেলবে সব প্রতিরোধ। কিন্তু কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। রাজপুতরা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে অসংখ্য সৈন্যের এক মহাসমুদ্রকে তারা স্তব্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু পদ্মিনী? সে কোথায়? তাকে না হলে যে চলবে না। সে কি বুঝতে পারছে না দিল্লীর সুলতান কতটা মোহমুগ্ধ? সে কি জানছে না, এবারে চিতোরগড় কিছুতেই রক্ষা পাবে না। সেখানকার কিছুই বাঁচবে না।

সুলতান চিতোরগড়ের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। সেই দৃষ্টিতে যতটা জ্বালা, তার চেয়েও বেশী যেন প্রার্থনা।

প্রভাতের সূর্য একটু আগেই উঠেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রতিদিনের মত বার হয়ে আসবে একদল রাজপুত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। পতঙ্গ এই ভাবেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে একটা বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। পতঙ্গ নিজের জীবন দিয়েই তুষ্ট। কিন্তু এরা প্রত্যেকে নিজেদের সঙ্গে সুলতানের অন্তত পাঁচজন করে সিপাহীর জীবন নিয়ে যায়।

সুলতানের কানে মৃত্যু পথযাত্রী সেই রাজপুত তরুণের শেষ উক্তিটুকু বেজে ওঠে। সে প্রশ্ন করেছিল,—কে তুমি?

উত্তর পেল—মহারাণা।

এর অর্থ কি? তরুণের মাথায় ছিল রাজছত্র। কিন্তু সে তো মহারাণা

নয়। লক্ষ্মণ সিং মহারাণা। তবে? সে কি মহারাণাকে স্মরণ করল শেষ সময়? বুঝতে পারা গেল না। রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো না।

কোথায় তুমি পদ্মিনী। ওই গড়ের কোন কক্ষে রয়েছ এখন তুমি? ডানা থাকলে আমি উড়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার ডানা নেই। তাই শক্ত মাটির উপর দিয়ে রক্ত পিচ্ছিল পথেই আমাকে এগোতে হবে। আর সময় নেই। আজই একটা চূড়ান্ত কিছু করে ফেলতে হবে।

চেঁচিয়ে ওঠে সুলতান আলাউদ্দিন—সিপাহসালার?

—জাঁহাপনা?

—ডাকো তোমার সমস্ত সেনাপতিদের। আজ—আজই সন্ধ্যার মধ্যে চিতোরের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে।

সবাই জড়ো হয় সুলতানের সামনে। সুলতান তাদের আক্রমণ পদ্ধতি বলতে থাকে।

ঠিক সেই সময় গড়ের দিক থেকে বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি ভেসে আসে। রণ-দামামা। ওরা আসছে। আবার এক দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে পাঠাচ্ছে ওরা। কিন্তু আর নয়। একদল এদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। বাকী সবাই এগিয়ে যাবে চারদিক থেকে।

—জাঁহাপনা। রাণা লক্ষ্মণ সিং।

সুলতান দেখে সত্যিই তাই। রাণা লক্ষ্মণ সিং-ই বটে: আর তার মাথায় প্রতিদিনের মতই একটি নতুন রাজছত্র ধরা রয়েছে।

একজন বলে ওঠে,—ওই যে সেই ভীম সিং।

—তাই তো। ঠিক চিনতে পারা যায়। একটু মোটা হয়েছে যেন।

সুলতান চেঁচিয়ে ওঠে, চুপ্ করো। ওরা ছেলেখেলা করতে আসছে না। দেখছ না, সমস্ত চিতোর এগিয়ে আসছে? প্রস্তুত হও।

সেদিনের সেই যুদ্ধের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে ছিল এক মরণ যজ্ঞ। বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় রাজপুতের অসম সংগ্রাম। কিন্তু এই সংগ্রাম বহু-যুদ্ধবিশারদ আলাউদ্দিনের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে।

তারপর সৈন্য সংখ্যা কমে আসতে শুরু করল রাণার পক্ষের। প্রথমেই হত হল ভীম সিং। তারপর বাদল। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। বড় আশা ছিল গোরার মত নিহত শত্রুসেনা বেষ্টিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের।

মৃত্যুর সময় সে দেখল অন্তত দশজন সিপাহীর শব তার পাশে। মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। দেহ শীতল হল। ভানুলোকের পথে যাত্রা করল তার আত্মা। সেখানে গোরা আর কলাবতী কবে থেকে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সবার শেষে মহারাণা লক্ষ্মণ সিং-এর পতন হল। আল্লাউদ্দিনের তরবারির আঘাত তার রণ-ক্লান্ত দেহ প্রতিহত করতে পারল না।

সুলতান বাহিনী জয়োল্লাসে মত্ত হয়ে ছুটে চলল চিতোরের দিকে। শেষ রক্ষা-ব্যূহ বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

বারো বছর আগে সুলতান একদিন চিতোর নগরীতে প্রবেশ করেছিল। দীর্ঘদিন পরে আজ দ্বিতীয়বার সে প্রধান প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে পদার্পণ করল নগরীর মাটিতে। দুইবারের প্রবেশের মধ্যে কত পার্থক্য। সেবার সে এখানে এসেছিল বহু-সম্মানিত অতিথি হিসাবে। সেবারে মহারাণা থেকে সুরু করে প্রতিটি রাজপুত তার ওপর ন্যস্ত করেছিল গভীর আস্থা। আর এবারে? এবারে সম্মানিত হবার কোন উপায় নেই। সম্মান দেখাবার মত কোন ব্যক্তি এখানে অবশিষ্ট রয়েছে কিনা সন্দেহ। থাকলেও দেখাবে না। তাতে সুলতানের বিন্দুমাত্র এসে যায় না। কারণ এবারে সে বিজয়ী বীর। এবারে সে নিজের শক্তিতে পথ করে নিয়েছে।

সূর্য অস্ত যেতে বিলম্ব নেই। তারপর অন্ধকার নেমে আসবে ধীরে ধীরে! এটি হবে চিতোরের বিনিদ্র রজনী। তবু রাত অতিবাহিত হবে। কারণ পৃথিবীর নিয়ম কোন তুচ্ছ নগরীর প্রতি সমবেদনায় পাল্‌টে যায় না। তাই আবার সূর্য উঠবে। কিন্তু সেই সূর্য দেখবে পরাধীন চিতোরকে। স্বাধীন আর গর্বিত চিতোরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। কতদিনের জন্যে কে জানে?

আলাউদ্দিনের সৈন্যরা লুণ্ঠন আর নির্বিচার হত্যায় মত্ত হয়ে উঠল।

চিৎকার করে ওঠে সুলতান,—বন্ধ কর। আগে চল প্রাসাদে। পদ্মিনীকে চাই। তার গায়ে যদি বিন্দুমাত্র আঁচড় দেয় কেউ আমি স্বহস্তে তাকে বধ করব।

আলাউদ্দিনের পেছনে পেছনে সৈন্যরা এগিয়ে চলে প্রাসাদের দিকে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই আলাউদ্দিন দেখতে পায় প্রাসাদের ওপরের আকাশ রক্ত বর্ণ।

চমকে উঠে সুলতান,—এ কি!

পদ্মিনীকে ঘিরে কয়েকশত রমণী। জহরব্রতের অনুষ্ঠানের সব কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। নীচে বিরাট একটি অগ্নিকুণ্ড। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। তার শিখা ওপরে উঠছে।

প্রাসাদ শীর্ষ থেকে রত্না নেমে এসে বলে, এবারে সময় হয়েছে। ওরা চিতোরে ঢুকতে সুরু করেছে।

পদ্মিনী সবাইকে তার সামনে ডাকে। তারা এসে দাঁড়ালে সে শান্ত ভাবে বলে—আমাদের স্বামীপুত্র সবাই ভানুলোকে যাত্রা করেছেন। এবারে আমরা নিশ্চিন্ত। আমি সবার আগে দাঁড়াচ্ছি। আমার পরে মহারাণা লক্ষ্মণ সিং-এর মহিষী। তারপরে লক্ষ্মণ সিং-এর পুত্রবধূরা। তারপর অন্যেরা।

লক্ষ্মণ সিং-এর মহিষী বলে—আমরা আবার এই চিতোরেই ফিরে আসব। তার চেয়েও আনন্দের কথা আমরা আমাদের স্বামী পুত্রের কাছে যাচ্ছি।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। তারপর সর্বপ্রথম পদ্মিনী লাফিয়ে পড়ে সর্বভুক অগ্নিদেবতার অঙ্কে। ভীম সিংএর ভালবাসার সামগ্রী, সুলতান আলাউদ্দিনের কামনার বস্তু, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী এক মুহূর্তেই অদৃশ্য হল চিরতরে। তারপর একে একে সবাই। একা পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছিল অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়। তার খেয়াল ছিল না। সহসা এক সময় দেখল কেউ নেই অবশিষ্ট।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে। পলক পড়ে না তার।

সেই সময়ে পেছনে দ্রুত পদ শব্দ শুনতে পায়। দেখে পাঠান সেনা। তাদের সামনে এক বিরাট পুরুষ। ছুটে এসে তার লৌহ কঠিন হস্তে তার কাঁধ চেপে ধরে বলে—পদ্মিনী কোথায়? কোথায় সে?

পুরোহিত হাত বাড়িয়ে নীচের আগুনের দিকে দেখিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তক আলাউদ্দিনের তরবারিতে স্কন্ধচ্যুত হয়। তাকে নিক্ষেপ করা হয় অগ্নিতে। আলাউদ্দিন উন্মত্তের মত চিৎকার করে ওঠে—সব ধ্বংস কর। চিতোরকে মাটীতে মিশিয়ে দাও। একটি অট্টালিকাও যেন মাথা উঁচু করে না থাকে। আলাউদ্দিন উঠে যায় প্রাসাদ শীর্ষে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে উপভোগ করতে থাকে তার বাঁধন-ছাড়া সেনাবাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য। চারদিকের আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। হাজার জহরব্রত অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেন। সুলতান পাগলের মত অট্টহাসি হেসে ওঠে হো হো হো—

সে তার পাশে দণ্ডায়মান সেনাপতিদের ডেকে ডেকে বলতে থাকে,—

মুবারক আরও ধ্বংস চাই। যাও ওদের বলগে। জব্বার, যাও ওদের গিয়ে বল, শুধু আগুন লাগালে চলবে না। ভগ্নাবশেষ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

এই ভাবে সবাইকে একে একে সেখান থেকে সরিয়ে দেয় সুলতান। তার আদেশের ভেতরে যত ক্রোধ তার চেয়েও বেশী যেন ক্রন্দন। সেই ক্রন্দনের রেশ সিপাহসালারের কানে বাজতে সে স্তম্ভিত হয়ে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে। সে বিশ্বাস করতে পারে না।

হঠাৎ সুলতান যেন জেগে ওঠে,—না—না সব নয়। কে আছো?

সিপাহসালার তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—সিপাহসালার, সব নয়.—সব নয়। ওদের গিয়ে বল পদ্মিনীর কক্ষ, পদ্মিনীর বাগিচা, পদ্মিনীর কোন কিছুতে যেন হাত না দেয়। সেগুলো অটুট থাক্। অটুট থাক্।

—যে হুকুম, খোদাবন্দ্।

দিল্লির সুলতানের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের কোন এক নিভৃত কোণে এই কোমলতাটুকু কেমন ভাবে যেন লুকিয়ে ছিল। হয়ত যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রথম বয়সের মাদকতা কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছিল একটি সুন্দর ফুল। সেই ফুলের সৌরভ অতীতের এতগুলো বছর পার হয়ে এসে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আমোদিত না করলেও সুলতান আলাউদ্দিনের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি। তবে আজকালকার মানুষের লাভ এইটুকু যে সেদিনের চিতোরের আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক দর্শনার্থীরা পদ্মিনীর আবাস গৃহটি দেখে তাদের ভ্রমণকে সার্থক করে তুলতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসে আলাউদ্দিন নামে কোন সুলতান না থাকলে পদ্মিনী নামে কোন রূপসীর কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেতো না। চিতোরের কত মহারাণার কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু মহারাণীর নাম কেউ বলতে পারে? অথচ পদ্মিনীর স্বামী মহারাণাও ছিলেন না। সুতরাং এই কাহিনীর প্রকৃত নায়ক আলাউদ্দিন।

———